যুদ্ধে গেলেন হর্ষবর্ধন

শিবরাম চক্রবর্তী

শ্রীপ্রকাশ ভবন

প্রথম প্রকাশ
শ্রাবণ ১৩৭১

প্রকাশিকা
শুক্লা দে
শ্রী প্রকাশ ভবন
এ৬৫ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট
কলকাতা ১২

চিত্রশিল্পী
অহিভূষণ মালিক

মুদ্রক
অজিতকুমার সাউ
রূপলেখা প্রেস
৬০ পটুয়াটোলা লেন
কলকাতা ৯

শ্রীসনৎকুমার চট্টোপাধ্যায়
শ্রীরবিকিরণ মুখোপাধ্যায়
শ্রীঅর্ধেন্দু চট্টোপাধ্যায়
শ্রীঅমলেন্দু চট্টোপাধ্যায়

—জয়যুক্তেষু

যুদ্ধে গেলেন হর্ষবর্ধন

যুদ্ধে গেলেন হর্ষবর্ধন

জেনারেল ফ্রাঙ্কোর যা বোমার ধাক্কা! ম্যাড্রিড এবং তার আশেপাশে খুব কম বাড়ী ঘরই আস্ত ছিলো। ঈশান কোণে মেঘের আবির্ভাব যেমন ঝড়ের পূর্বাভাস, তেমনি আকাশের যে কোনো কোণে এরোপ্লেন-দর্শন মানেই বোমার অধঃপতন। হয় তারা সশব্দে পড়বে এসে মাথায়, কিংবা দয়া করে নিতান্ত মাথায় না পড়লেও বাড়ার হাতায় তো বটেই! অবশ্য, বোমার ছোঁয়াচ থেকে বাঁচা খুবই শক্ত, মাথা বাঁচিয়ে বাড়ীর ছাদে পড়লেই বা এমন কি সান্ত্বনা? বাড়ী-ঘর চাপা পড়লেই কি মানুষ বাঁচে?

এত ধুমধাড়াক্কা হর্ষবর্ধনের পছন্দ নয়। এতটা বাড়াবাড়ি গোবর্ধনেরও ভালো লাগছিলো না। তা ছাড়া মেঘেদের একটা দস্তুর আছে, সাধারণত ঈশান কোণ থেকেই তারা দেখা দেয়, এই কারণে তাদের সম্বন্ধে সতর্ক হওয়া সহজ, হর্ষবর্ধনের ধারণা। এমন কি, ঈশান কোণ যে ঠিক কোন্ দিকটা আদৌ না জানলেও চলে যায়।

আকাশের যে কোণেই হোক, কি মাঝখানেই হোক, মেঘ দেখেছো কি আর নৌকো চেপো না! এইভাবেই তাঁরা আকাশের মেঘ আর জলের নৌকোর—দুয়ে মিলে জলমগ্নতার হাত থেকে আত্মরক্ষা করে এসেছেন চিরকাল।

কিন্তু এরোপ্লেনগুলোর কোনো দিগ্বিদিক জ্ঞান নেই—যে কোনো কোণ থেকেই এসে পড়ে অকস্মাৎ। এসে পড়লেই হলো। তারপর সামলাও ঠ্যালা!

বাজ্, বাজ্, বাজ্, বাজ্, বাজ্ বাজ্, বাজ্, বাজ্ বাজ্, বাজ্, বাজ্....
ঐ আসছে বোমারু বিমান!

হর্ষবর্ধন বলেন—'নাঃ, বোম্বাই গিয়ে ভালো করিনি গোবরা!'

'কেন দাদা?'

'কেন আবার! জলেই এসে জল বাধে—দেখছিস না।'

গোবরার আধ্যাত্মিক দৃষ্টিশক্তি স্বভাবতঃই একটু কম। তাই সে কিছুই দেখতে পায়না!

'দেখছিস নে, বোমার ধুম? বোমাকে এরা বলে কী, শুনি? কী বলে ইংরিজিতে? বম্ব! আর বম্বকে একবার ডেকে দেখ, তাহলেই টের পাবি।'

গোবর্ধন তবু বুঝতে পারেনা। বম্বকে আবার ডাকবে কি? ও তো না ডাকতেই দেখা দেয়। ছেলের হাতে খাবারের ঠোঙা থাকলে যা হয়, চিলেদের মতোই ওদের স্বভাব অনেকটা! ওকে আবার ডাকতে হয় নাকি, আদর করে?

'আস্ত একটা হাঁদা তুই মোদ্দাৎ।' হর্ষবর্ধন বলেন এবার, 'বম্বকে ডাকা—এই সামান্য কাজটা পারছিস্ নে? আকাশের দিকে তাকাচ্ছিস কি হাঁ করে? বম্ব আয়—বম্ব আয়, বোমকে ডাকা তো এই? তাহলেই হলো বম্বায়! সন্ধি করেই হলো স্বরসন্ধি। মৃদু মধুর হাস্যে ভরে ওঠে ওঁর মুখ: 'আর বম্বায় যা, বোম্বাইও তা।'

দাদার বিচক্ষণতায় হর্ষবর্ধন মুহ্যমান হয়ে পড়ে। ওর মুখে কথাই সরে না।

'না বোম্বাই যাই, না বোমার পাল্লায় এসে পড়ি।'

'সে কথা ঠিক দাদা।' গোবর্ধন সায় দেয় এতক্ষণে।

তারপর ওরা চুপ হয়ে থাকে। বহুক্ষণ বাদে বাক্যস্ফূর্তি হয় গোবরার: 'র‍্যাট্ সাহেব বললে যে, ইসপেনের সবই ফরেষ্ট। তা ফরেষ্ট কই ইসপেনে? কেবলই তো শহর দেখছি।'

হর্ষবর্ধন ধমকি দেন—'এখন তুই কী দেখছিস জঙ্গলের? জঙ্গলের কী হয়েছে এখন?'

'কেন? এত বড়ো ইসপেন, জঙ্গল থাকলে তা চোখে পড়বে না মানুষের? জঙ্গল তো আর জীবাণু নয় যে লুকিয়ে থাকবে? জীবাণুও না, ভগবানও না—তবে? গোবর্ধন একটু অবাকই হয়।

'বাঃ, এই তো এখন শহরগুলো ভাঙছে সবে! এর মধ্যেই জঙ্গল? আগে শহরগুলো সেরে ফেলুক, মানুষগুলোকে সাবাড় করুক। তারপর আপনি জঙ্গল হবে, কারুকে দেখতে শুনতে হবে না। এতবড়ো ইসপেন, এখন কেবল লম্বায় আর চওড়াতেই বড়ো, তখন উচ্চতাতেও বড়ো হবে।'

'তাহলে র‍্যাট্ সাহেবের বেশ দূর-দৃষ্টি আছে, কি বলো দাদা?'

'থাকবে না? কত বড়ো ফরেষ্ট অফিসার! লড়াই বেধেছে কি অমনি চলে এসেছে—ইসপেনে। জঙ্গল গজাবার আগেই জঙ্গল ইজারা নেবার মৎলবে। আর বছর দুই যদি লড়াই চলে, অমনি সারা ইসপেন দেখবি বেবাক ফাঁক। আর বছর পাঁচেক পরে বেদম জঙ্গল। একবারে গভীর অরণ্য।'

'রোদন করবার লোকটিও নেই।' দীর্ঘশ্বাস ফেলে গোবরা।

'আসল কথা কি জানিস? ওই র‍্যাট্ সাহেবই কি, আর ওই ক্যাট্ সাহেবই কি, আর ইসপেনের এই লালমুখোগুলোই কি, আসলে এরা সব জংলী—এখনো সঠিক সভ্য হয়ে ওঠেনি তো। এখনো ঘোরতর জংলী, তাই এরা জঙ্গল ভালোবাসে, যুদ্ধ বাধিয়ে জঙ্গল বাধাতে চায়। আমাদের মতো সুসভ্য নয় তো! আমরা কোথায় আমাদের জঙ্গল কেটে শহর বসাচ্ছি, আর এরা কোথায়, বসানো শহর ভেঙে গুঁড়িয়ে জঙ্গল বানাতে যাচ্ছে! এতেই বোঝ।'

গোবর্ধন বুঝবার চেষ্টা করে, প্রাণপণ চেষ্টাই করে, কিন্তু পেরে ওঠেনা। পুনরায় দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে সে।

ইতিমধ্যে অকস্মাৎ গগনপথে…

বাজ্, বাজ্, বাজ্, বাজ্, বাজ্, বাজ্, বাজ্, বাজ্, বাজ্—

এবং সঙ্গে সঙ্গে—ব্রাম্ ব্রাম্!

গোবর্ধন আর বিরক্তি চাপতে পারেনা, চেঁচিয়ে ওঠে 'পাজি-কোথাকার!'

হর্ষবর্ধন গুরুগম্ভীর হন: 'ছিঃ গোবরা, মুখ খারাপ করো না, মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে মুখ খারাপ করতে নেই! এখন, কখন আছি কখন নেই, ভগবানের নাম করাই ভালো নয়কি? তবু শেষ মুহূর্তে ভগবানের নাম নিয়ে স্বর্গে যেতে পারবো। এই রকম স্থান কালে, এরকম অবস্থায় কি মন্দ কথা মুখে আনতে আছে? ছিঃ, তুমি যদি ভালো করে ভেবে দেখো তাহলেই বুঝতে পা—'

এমন সময়ে হর্ষবর্ধনের অনতিদূরেই একটা বোমা এসে পড়ে। উৎক্ষিপ্ত মাটির চাপড়া ছিটকে এসে ধাক্কা মারে তাঁর নাকে।

হর্ষবর্ধন লাফিয়ে ওঠেন; 'ওরে বাবারে, গেছি গো! গেছি গো! গেল বুঝি চোখটা! পাজি, কেলে পাজি! পাজির পা-ঝাড়া।'

চোখ কচলাতে কচলাতে যার-পর-নাই মন্দ কথা সব তিনি মুখে আনতে থাকেন। যত খুশি হয় তাঁর, যতক্ষণ না তাঁর আশ মেটে, তিনি ক্ষান্ত হন না।

গোবরা হাঁ করে শোনে।

তোমাদের মধ্যে যারা, হর্ষবর্ধন ও গোবর্ধনকে আগে থেকেই চেনো তারা এই দুই ভাইকে হঠাৎ 'ইসপেনের' যুদ্ধক্ষেত্রে দেখে হয়তো একটু অবাকই হয়েছো। কিন্তু এতে আশ্চর্য হবার আর কি আছে, আজকের দিনে কোনো ব্যাপারেই বিস্মিত হবার কিছু নেই।

তবু কালমাহাত্ম্য যতই থাক, হর্ষবর্ধনদের স্থান পরিবর্তনের কারণ আছে বৈ কি। কেন এই অঘটন ঘটলো, তার একটু ইতিহাস আছে। সংক্ষেপেই বলা যাক এখানে—

হর্ষবর্ধন ও গোবর্ধন দু'ভাই, অল্পবিস্তর বড়ো লোক ও ক্যাবলা

প্রকৃতির। আসামের জঙ্গলে এঁদের প্রকাণ্ড কাঠের ব্যবসা এবং সেখানেই এঁদের বসবাস। অকস্মাৎ ওঁদের খেয়াল হলো টাকা ওড়াবার এবং নিজেরা ওড়বার—এবং এ উভয় কাজের পক্ষে কলকাতাই প্রশস্ত ও সুবিধাজনক বলে, সেই মহানগরীতে একদা সুপ্রভাতে ওঁরা পদার্পণ করলেন। তারপর থেকে দিনে দিনে ওঁরা দেহে আর অভিজ্ঞতায় যেমন শশিকলার (কিম্বা মর্ত্তমান কলার) মতো বাড়তে লাগলেন, তেমনি কলকাতায় এসে যে সব মজার কাণ্ড ওঁরা বাধিয়েছিলেন, 'কলকাতার হালচাল' যারা পড়েছো, ইতিমধ্যে জেনে ফেলেছো নিশ্চয়ই।

রোজ রোজ সেই একই কলকাতাকে একঘেয়ে দেখতে দেখতে প্রায় ওদের অরুচি ধরে আর কি, এমন সময়ে হর্ষবর্ধন প্রস্তাব করলেন—একবার পাগলদের রাসলীলাটা দেখে আসার, এ জায়গার তো হাড়-হদ্দ দেখা হলো, এখানে আর বিশেষ কিছু নেই দেখবার।

'পাগলের রাসলীলা—সে আবার কোথায় দাদা?'

'কেন, ম্যাডরাসে? নামেই তো প্রকাশ পাচ্ছে।' হর্ষবর্ধন প্রাঞ্জল করে দেন—'ম্যাড মানে কি? ম্যাড?'

পড়াশোনায় যে ল্যাড দস্তুরমতোই ব্যাড, সেও অন্ততঃ ম্যাড কথাটার মানে জানে। গোবরারও জানা ছিলো।

অতএব ওঁরা দু'ভাই, মাদ্রাজে যাবার মৎলবে, মাদ্রাজেরই টিকিট কেটে, একদিন রেলগাড়ীতে উঠে বসলেন, বসলেন কিন্তু বোম্বে মেলে, —ভুলক্রমেই!

ভুলটা ধরা পড়লো যথাসময়েই। অর্থাৎ যখন বোম্বায়ের প্রায় আধাআধি পথ ওঁরা পৌঁছে গেছেন, তখনই।

হর্ষবর্ধন বলেন তখন—'তা বোম্বাই বা এমন মন্দ কি! সেখানেই যাওয়া যাক! কথায় বলে বোম্বাইকা লাড্ডু, খুব বিখ্যাত জিনিস—যো খায়া উভি পস্তায়া, যো নেহি খায়া উভি—'

গোবর্ধন প্রতিবাদ করে—'উঁহু'। বোম্বায়ের না, দিল্লীর।'

দু'ভায়ে বচসা বেধে যায়। লাড্ডু দিল্লীকা না বোম্বাইকা, দিল্লীরই যদি হয় তাহলে বোম্বায়ের কোন্ জিনিস বিখ্যাত এবং লাড্ডু জাতীয় প্রসিদ্ধ যদি কিছু বোম্বায়ে আদৌ না থেকেই থাকে, তবে লোকে যায় কেন, এবং যদি বা যায়, গিয়ে কি খেয়ে তবে পস্তায় তারা? আর পস্তাবার যদি সুযোগ নাই থাকে তবে কি জন্যেই বা বোম্বে যাওয়া এত কষ্ট করে? লোকও নেহাৎ কম যাচ্ছে না তো বোম্বায়ে। এই বিরাট মেল গাড়ী ভর্তি—সকলেই তো প্রায় বোম্বাই-যাত্রী। এরা সব দিল্লীই বা যাচ্ছে না কেন তবে? লাড্ডুর কথা বিবেচনা করলে দিল্লীর প্রলোভনটাই তো প্রচণ্ডতর বলে মনে হয় ওঁদের!

যখন গাড়ী গিয়ে ভিক্টোরিয়া টার্মিনাসে থামলো তখন পর্যন্ত এই আলোচনাই চলছে—দু'জনের মধ্যে।

বোম্বাইয়ে নেমে ওঁরা খবর পান ওঁদের বিশেষ পরিচিত, আসামের ফরেষ্ট অফিসার, র‍্যাট্‌ক্লিফ সাহেব ছুটি নিয়ে চলেছেন বিলেতে। এমনকি, উনি প্রায় জাহাজেই চেপে বসেছেন, আর ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যেই বোম্বাই থেকে পাড়ি মারবেন। এই রকম গুজব।

এতদিনের সম্বন্ধ সূত্রের পর এত কাছাকাছি এসে র‍্যাট্‌ক্লিফের সঙ্গে দেখা না করাটা ভালো দেখায় না—বিশেষ এটাকে যখন শেষ দেখাই ধরা যেতে পারে, অন্তত বেশ কিছুদিনের মতো তো বটেই। বড়ো সাহেবের বিলেত প্রাপ্তি এবং বাড়ীর কর্তার কাশী প্রাপ্তির, অবশ্য দেহরক্ষা না করে—প্রায় এক জাতীয় ব্যাপার। খুব কমই তাঁরা সেখান থেকে এ-মুখো হন। এসব যাত্রায় ফেরার কথাই নেই, বলতে গেলে প্রায় ফেরারী হবার দাখিল।

কিন্তু র‍্যাট্‌সাহেব যে কোন্ জাহাজে পাততাড়ি গুটোচ্ছেন, ওঁদের তা জানা নেই এবং জানা থাকলেও যে বিশেষ কিছু সুবিধে হতো, এমন মনে হয়না; কেননা, অসংখ্য জাহাজের ভেতর থেকে সেই

জাহাজটিকে চেনা আর খুঁজে বার করা সহজ কোনো মতেই ছিলো না ওঁদের পক্ষে।

তবু হয়তো সেই জাহাজ, ভগবানের মতো, নিজ গুণেই দেখা দিতে পারে, এই ভরসায় ওঁরা জাহাজঘাটায় ইতস্ততঃ বিচরণ করতে থাকেন। জেটির এই সামান্য প্রসারের মধ্যেই, কেবল পায়চারীর ফলে, যখন প্রায় পঞ্চাশ মাইল হাঁটা হয়ে গেছে, তখন সাদাসিধে পোষাকপরা এক পুলিশের গোয়েন্দার সন্দেহের উদ্রেক না হয়েই পারে না। সে এসে ওঁদের পাকড়ায়—'কৌন্ হ্যায় তুম্‌লোক? কাঁহাকা আদমী?'

'আসামী হ্যায়!' গর্বের সহিত বলেন হর্ষবর্ধন।

ব্যস্, আর উচ্চবাচ্য নয়, অমনি সেই গোয়েন্দা—এতখানি বিনা পোষাকে যে তাকে পাহারোলা বলে সন্দেহ করবার ঘুণাক্ষরও নেই—তাঁদের গ্রেপ্তার করে নিয়ে গিয়ে জেটি-দারোগার কাছে হাজির করে।

'দো আসামী, দোনো ডাকু, পাকড় গয়ি সাব!'

তারপরে অতিকষ্টে, তাঁরা আসামের লোক বলেই আসামী, স্বভাবতঃই আসামী নয়, এবম্বিধ অনেক কৈফিয়ৎ দিয়ে, দারোগা সাহেবের কবল থেকে কোনো রকমে উদ্ধার পান এবং সেই অফিসারের কাছ থেকেই র‍্যাট্‌ক্লিফ সাহেবের হদিশ উদ্ধার করেন।

তারপর যৎকিঞ্চিৎ কাঞ্চন মূল্যের বিনিময়ে সেই সাদা-সিধে পাহারোলার সহায়তা নিয়েই তাঁরা র‍্যাট্‌ক্লিফ-সঙ্কুল সেই বিলেতগামী জাহাজের ডেকেই সরাসরি গিয়ে উত্তীর্ণ হয়েছেন।

র‍্যাট্‌সাহেব তো তাঁদের দেখতে পেয়েই পুলকে গ্যাট্‌-ম্যাট্ করে ওঠেন—'হ্যালো হাবাড়ডান, হ্যালো গাবাড়ডান! হাউ ডু ইউ ডু!'

হাবাড়ডান—গাবাড়ডান প্রত্যুত্তরে শুধু বলে—'হ্যালো, হ্যালো!' বহু দিবসের পরে, প্রিয়জন-মিলনে, আনন্দের আতিশয্যে ওঁদের সুবিধে মতো কথাই বেরোয় না মুখ দিয়ে।

এ-কথা সে-কথার পর সাহেব ওঁদের জানান যে, উনি বিলাতে

যাচ্ছেন না এখন, এখান থেকে সোজা স্পেনে যাবেন, সেখানে কিছুদিন কাটিয়ে তারপরে তাঁর বিলেতপ্রাপ্তি ঘটবে।

হর্ষবর্ধন জিগ্যেস করেন—'ইসপেন? হোয়াই?'

'ফর রেস্ট!' সাহেব হেসে বলেন। বক্তব্য বিষয়টাকে আরো বিশদ করবার জন্যে, হিন্দির খিচুড়ী বেশ করে মিশিয়ে দেন—'আলবাৎ, ফর হোয়াট এল্‌স্?'

গোবর্ধনও ইংরিজি কথায় দাদার প্রায় কাছাকাছিই যায়। সে বলে—'অফ কোর্স!' পিছ-পা হবার ছেলে সেও নয়।

'ফরেষ্ট অলসো ইন ইসপেন?' হর্ষবর্ধন প্রশ্ন করেন।

'হোয়াই নট্? এ ভেরী রেস্টফুল প্লেস, মোর সো ফর দি কজ্ অফ দি ওয়ার।' সাহেব হাস্য করেন।

গোবর্ধন আবারও বলে—'অফ কোর্স।'

সাহেবের সব কথাই সে অবিকল বুঝতে পারে, তার দাদার মতোই চমৎকার। তাই সব কথাতেই সায় দিতে সে কার্পণ্য করে না।

এবার হর্ষবর্ধনের 'অফ কোর্স' বলার পালা ছিলো, সুযোগটা গোবর্ধনের স্বার্থপরতার জন্যে এভাবে হাতছাড়া হওয়ায়, তিনি মনে মনে গোবরার প্রতি ভারী চটে যান। বলেন—'দেন ইউ গো, গুডবাই সাহেব! টেক্ অ্যাজ মেনি ফরেষ্ট অ্যাজ ইউ ক্যান্—ইন ইসপেন।'

গোবর্ধন বলে—'অফ কোর্স! ইন ইসপেন! অফ কোর্স!'

তারপর দুই ভাই বিদায় নেয় সাহেবের কাছে। বিদায় নিয়ে, আসবার পথে হঠাৎ এক বাধা পড়ে, এমন বিশেষ কিছু নয়, এক কেবিনের মধ্যে বেড়াল আর কাকাতুয়ার বাদানুবাদ—

বেড়ালটা, কতকগুলো কেক্‌কে একলা এবং অসহায় অবস্থায় পেয়ে, গলাধঃকরণের দুশ্চেষ্টায় ছিলো, কিন্তু কাকাতুয়াটা বাধা দেয়। ভীষণ চেঁচামেচি করে, ভয়ানক প্রতিবাদ করতে থাকে সে। বেড়ালের তখন কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থা!

হর্ষবর্ধন আর গোবর্ধন নিষ্পলক নেত্রে দেখতে থাকেন। এমন অদ্ভুত দৃশ্য, ওঁরা এ জীবনে দেখেন নি --

ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে যায়, ওঁদের পলক পড়ে না, টনক নড়ে না। অবশেষে, জাহাজ যখন মাইল বিশেক এগিয়ে গেছে আরব সমুদ্রে, অ্যারেবিয়ার দিকে, তখন ওঁদের হুঁস হয়। কিন্তু তখন আরব্য উপন্যাসের মতোই মনে হতে থাকে ওঁদের!

কখনই বা ঘণ্টা দিলো, কখনই বা ছাড়লো জাহাজ! এর মধ্যেই কেটে গেল এতক্ষণ? আশ্চর্য!

অগত্যা আবার তাঁরা র‍্যাট্‌ সাহেবের কাছে ফিরে গিয়ে এই আকস্মিক দুর্ঘটনাটা ব্যক্ত করেন এবং তাঁর সৌজন্যে ও সাদর নিমন্ত্রণে, সকৃতজ্ঞ চিত্তে, তাঁরাও ইসপেনে যেতেই প্রস্তুত হন।

জাহাজে থাকতে ক'দিনে হর্ষবর্ধনরা যে সব কাণ্ড বাধান সে হচ্ছে আর এক প্রকাণ্ড কাহিনীর ব্যাপার! যাই হোক, র‍্যাট্‌ক্লিফ সাহেব তো কোনো রকমে দুই ভাইকে সামলে নিয়ে স্পেনের উপকূলে এসে অবতীর্ণ হন। সেখান থেকে ম্যাড্রিড-গামী একখানা ট্রেনে উঠে বসেন তাঁরা তিনজনেই।

ডাঙায় নেমেই, স্পেন সম্বন্ধে, তাঁরা যে সব মন্তব্য করেছিলেন, ভাগ্যিস, স্প্যানিয়ার্ডরা বাংলা বোঝে না, তাহলে আতিথ্য তাঁদের পক্ষে খুব মুখরোচক হতো না নিশ্চয়। তবে সব কথার মধ্যে এই কথাটি উল্লেখযোগ্য: 'ম্যাডরাস যেতে যেতে ম্যাডরিড।' হর্ষবর্ধন বলেছেন অবশেষে। 'দুটোর মধ্যেই ম্যাডনেস আছে, যথেষ্টই আছে।'

'হ্যাঁ দাদা, ও দুই-ই এক।' গোবর্ধন সর্বতোভাবে সায় দিয়েছে দাদাকে। সুদীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে হর্ষবর্ধন সান্ত্বনা লাভের চেষ্টা করেছেন, যা সামান্য কিছু সান্ত্বনা পাওয়া যায় এর ভেতর থেকে।

এই পৃথিবীতে বাস করতে গেলে পাগলদের সঙ্গেই বাস করতে হবে, পাগলামি বাঁচিয়ে পা ফেলা অসম্ভব। কাজেই যেখানেই

যাও, মাডনেসকে সইতেই হবে। হাসি মুখেই সইতে হবে এবং সেই সঙ্গে তোমার কাজও হাসিল করতে হবে…সেই হাসিমুখেই। হ্যাঁ।

হর্ষবর্ধনের এই গবেষণার এক বিসর্গও বুঝতে পারেনি গোবর্ধন। তবু সে ঘাড় নেড়ে দিয়েছে। অকপটে এবং অকাতরেই।

ট্রেন পথে সামান্য একটা দুর্ঘটনা হয়েছিলো। বিশেষ কিছু না, কেবল আকাশ এবং এরোপ্লেন থেকে অকস্মাৎ এক বোমা পড়ে। ট্রেনের ওপরেই পড়ে। ঠিক হর্ষবর্ধনদের ঘাড়ে নয়, এই যা রক্ষা আপাততঃ। বিপদ-সঙ্কুল পথে ট্রেনটা স্বভাবতঃই দ্বিধার সঙ্গে অগ্রসর হচ্ছিলো, বোমার আঘাতে, এতক্ষণে সত্যিই দ্বিধান্বিত হয়ে পড়ে একেবারে দু-আধখানা হয়ে যায়।

টিকটিকির ল্যাজ কাটা পড়লে সে যেমন মুহূর্তের জন্যেও দাঁড়ানো সমীচীন মনে করে না, এমন কি পেছনে ফিরে তাকায় না আর, নিজেকে নিয়েই সোজাসুজি ছুট মারে- তার পরিত্যক্ত অপভ্রংশের দিকে ভ্রূক্ষেপ করে না পর্যন্ত, রেলগাড়ীটাও তেমনি ইঞ্জিনের দিকের অর্ধাংশে আর কালক্ষেপ না করে, সমস্ত দ্বিধা দ্বন্দ্ব এবং বিচ্ছিন্ন পশ্চাঙ্গকে ফেলে রেখেই চটপট চম্পট দেয়, সটান ম্যাড্রিডের দিকেই।

ইঞ্জিনের দিকটাতেই ছিলেন র‍্যাট্‌ক্লিফ সাহেব, তিনি তো উধাও হলেন পলাতক অর্ধাঙ্গে, এদিকে পেছনের গাড়ীতে ছিলেন হর্ষবর্ধন আর গোবর্ধন, তাঁরা ধরা পড়লেন জেনারেল ফ্রাঙ্কোর জার্মান-বাহিনীর খপ্পরে! দূরদৃষ্টি আর বলে কাকে!

কিন্তু দূরদৃষ্টি থাকলে দুরদৃষ্টের হাত থেকে বাঁচা যায়। হর্ষবর্ধনের এই দূরদৃষ্টি ছিলো, ছেলেবেলা থেকেই ছিলো, স্বভাবতঃই ছিলো। জার্মান সেনানী যখন তাদের সবাইকে ঘেরাও করে, তাদের দলপতি এগিয়ে এসে, হাত তুলে নাৎসী সেলাম ঠুকে অভিনন্দন জানায় — 'হেইল্ হিটলার!' তখন ভাবে, কাকে সম্বোধন করে কে জানে।

হর্ষবর্ধনও ঠিক সেই কায়দাতেই হাত তুলে তেমনি বলেন, 'হেই

হ্যাটলার'! হর্ষবর্ধন নির্ভীক, সঙ্কোচ কি কুণ্ঠা নেই, সহাস্যমুখ হর্ষবর্ধনের। আগ গাড়ী সবাই, ভূতপূর্ব যাত্রা এবং সম্প্রতি বন্দী, যাবতীয় লোকের মধ্যে কেবল একমাত্র হর্ষবর্ধনেরই হাত ওঠে, একলা তাঁরই হর্ষধ্বনি শোনা যায়।

গোবরকে তিনি চাপা গলায় দাবড়ে দেন—'এই, করছিস কি? হাত তোল! চেঁচা! নইলে কোরবানি করে ফেলবে যে!'

গোবর্ধন হাতটা তোলে কেবল। অতি কষ্টে।

'চেঁচা! যে বিয়ের যে মন্ত্র, জানিসনে? বল- হেই হ্যাটলার।'

গোবর্ধন চেঁচায়—'হুই হুটলার!'

ফলে জার্মান দলপতি ওদের দু'ভাইকে দলভুক্ত করে নেন—নাজী পক্ষীয় ভেবে। বাকী সব পাজীদের—তাঁর মতেই অবশ্য—বন্দী করে, কোর্টমার্শাল করা হয় অর্থাৎ বন্দুকের সামনে সারি সারি সাজিয়ে দুড়্‌ম্‌ ঠুকে দেওয়া হয়—পরপর।

প্রত্যেক দুড়ুমে হর্ষবর্ধনের পিলে চমকায়, আর উনি বলতে থাকেন, 'ছি ছি! কী খারাপ জায়গাতেই না এসে পড়া গেছে। কিন্তু ঐ অব্যর্থ মন্ত্র…হায় হ্যাটলার, কিছুতেই ভুলিসনে যেন গোবরা! ঐটা বললাম বলেই বেঁচে গেলাম এ-যাত্রা! ভালো করে মুখস্ত করে রাখ। তাহলেই টিঁকে থাকতে পারবি কোনো গতিকে।'

অতঃপর হর্ষবর্ধনরা ফ্রাঙ্কোর দলের সঙ্গে, ওদের সহযাত্রী হয়ে, দলীয়ান ও বলীয়ান হর্ষবর্ধন ম্যাড্রিডের দিকে অগ্রসর হতে থাকেন। ম্যাড্রিড বিজয় করার দুরাকাঙ্ক্ষা নিয়ে।

কয়েকদিন ওদের সঙ্গে মিশেই অনেক কিছু শিখে ফেলেছেন উনি, এমনকি 'হেল্ হিটলারের' সম্যক অর্থও ওঁর হৃদয়ঙ্গম হয়েছে। ফ্রাঙ্কোর দলের মধ্যে স্পেনীয় ছিলো, ইতালীয় ছিলো কিন্তু ইংরিজি বিদ্যায় তারা সকলেই বিশেষ পারদর্শী, হর্ষবর্ধনের সমানই প্রায়, কাজেই ভাবের আদান প্রদানে ওদের কোনো পক্ষেই কোনো অসুবিধে নেই।

কেবল 'হেইল্ হিটলারের' সদর্থ জেনে হর্ষবর্ধন একটু অসন্তুষ্টই হন: 'আমি ভেবেছিলুম কোনো দেবটা-টেবটা, আরে ছাই, এ যে মানুষ রে! হাতী-ঘোড়াও না চারপেয়েও না, একেবারেই মানুষ।'

গোবরা বলেছে: 'কেন, মানুষ কী খারাপ? মানুষ যদি মানুষের মতো মানুষ হয়, যদি অবতার হয়—?'

'মানুষের মতো মানুষ না কচু! মানুষের মতো জন্তু বলতে পারিস বরং। মানুষ-মারা মানুষকে আর অবতার বলে না!'

পাছে কী অনর্থ বাধে, যদি দৈবাৎ বাংলা বুঝেই ফেলে ব্যাটারা, গোবর্ধন দাদার মুখে হাতচাপা দিলে।

হাতের চাপকে অগ্রাহ্য করে তার ফাঁক দিয়েই হর্ষবর্ধনের বাক্যস্ফূর্তি হয়েছে—'হ্যাঁ হাটলাও যদি হয় তবে আমরাই বা কী কম অবতার? আমরাও তো গাছ-মারা মানুষ! কত গাছকেই তো কেটে ধরাশায়ী করলাম! মানুষের মতোই অকাতরে কচুকাটা করেই—'

গোবর্ধনকে মানতে হয়েছে—'হ্যাঁ, সত্যিই, আমরাও অবতার কম নই তো! অন্ততঃ গেছো-অবতার বটেই তো!' আত্মপ্রসাদে হর্ষবর্ধনের বুক ফেঁপে উঠেছে; নেহাৎ পক্ষে হাফ অবতার তো নিশ্চয়ই হবো, আমরা?'

তারপরেই তিনি অন্তরের মৎলব প্রকাশ করেছেন এবং দেশে ফিরেই, তাঁর লোকজন কর্মচারীদের দিয়ে নিজেকে 'হেই হর্ষবর্ধন!' বলে ডাকাবেন—সদাসর্বদাই ডাকাবেন—আখচারই ডাকাবেন! ও রকম শুনতে ওঁর বেশ ভালোই লাগে। ইতিমধ্যে অবশ্য বাইরে চেঁচিয়ে ডাকার দুঃসাহস তাঁর হয়নি—তবে মনে মনে চেঁচিয়ে নিজেকে তিনি ডেকে নিয়েছেন, ভালো করেই দেখে নিয়েছেন। মন্দ শোনায়নি নিতান্ত! তবে ওটা একটু ইংরিজি করে আরো সংক্ষিপ্ত ও সহজ করে 'হেই হাবড়ডন' করে নিলে শোনায় আরো ভালো।

এ পর্যন্ত গোবর্ধনের সঙ্গে তাঁর মতদ্বৈধ হয়নি, কিন্তু এর পরেই বেধেছে গণ্ডগোল। হর্ষবর্ধনকে দাদা ছাড়া অন্য কোনো সম্বোধনে ডাকতে সে কিছুতেই প্রস্তুত নয়। অথচ হর্ষবর্ধনের ইচ্ছা যে, সেও সেই 'হাবাড়ডনের' দলভুক্ত হয়। পরিশেষে এইভাবে রফা হয়েছে। দেশে ফিরে তবেই তো ডাকাডাকি! আগে দেশেই ফেরা যাক। সেখানেই যে সন্দেহ-স্থল দুজনারই সমান সংশয় সেখানে।

মাইলের পর মাইল হেঁটে—কত মাইল আন্দাজ করা কঠিন, অবশেষে ওরা এসে পৌঁচেছেন ম্যাড্রিডের সম্মুখে। ম্যাড্রিড অবরোধ করে বসে আছেন ওঁরা। ফাঁক পেলেই ওর ভেতরেই, ওই অবরুদ্ধ শহরের ভেতরেই নাকি ঢুকতে হবে, আজ-কালের মধ্যেই সবেগে এবং সতেজেই ঢুকতে হবে—এই রকম আশঙ্কা হয় হর্ষবর্ধনের।

'ঢুকতে গেলেই কি ওরা সহজে ঢুকতে দেবে? শহরের মধ্যে আছে যারা?' গোবরা বলে, 'গুলি ছুঁড়তে পারে হয়তো।'

'পারেই তো!'

'তাহলে তো প্রাণ হারাবার ভয় আছে আমাদের?' সংশয়টা আর প্রকাশ না করে পারে না গোবরা 'নেই কি দাদা?'

'আছেই তো।' হর্ষবর্ধন বুক ফুলিয়ে বলেন: 'যুদ্ধ করা কি চারটিখানি? এতে প্রাণ বাঁচানোই কঠিন।'

গোবর্ধন বলে: 'প্রাণ দিতে হলে লোকে দেশের জন্যেই প্রাণ দেয়। বিদেশের জন্যে শেষটা বেঘোরে মারা যাবো?'

'প্রাণ দেয়া নিয়ে কথা! প্রাণ দেয়াই হলো আসল।' হর্ষবর্ধন জবাব দিয়েছেন, অত্যন্ত উদাসীনের মতোই: 'মারা গেলে তখন দেশই বা কি—আর বিদেশই বা কি। কার জন্যে দিলুম ভেবে কোনো লাভই নেই।'

লাভালাভের কথাটাই কিন্তু খতিয়ে দেখছে গোবর্ধন। তখন থেকেই মনটা খচখচ করছে তার। কেবলই তার মনে হয়—বিদেশে এসে শেষটা বাজে খরচ হয়ে যাবো, প্রাণটা দিয়ে ফেলবো পর-দেশের জন্যে? পরের দেশোদ্ধারে প্রাণপাত করার কী পরমার্থ? ফয়দাটাই বা কী? কেন, স্বদেশ কি ছিলো না গোবরাদের—তার জন্যে অক্কা পাওয়া কী যেত না একেবারেই?

ইত্যাকারে অগুনতি প্রশ্ন ওর মনে এসে উঁকি-ঝুঁকি মারে। অবশেষে বেফাঁস করেই ফেলে, 'না দাদা এ ভালো হচ্ছে না।'

'কী ভালো হচ্ছে না ?'

'এই বিদেশের জন্যে মরাটা !'

'তোর মতলবটা কী ?' হর্ষবর্ধন দারুণ গম্ভীর হয়ে যান : 'নিতান্তই বেঁচে থাকতে চাস নাকি ?'

'না, বাঁচতে আমি চাইনে।' গোবর্ধন ঘোরতর আপত্তি করে— 'বেঁচে আবার থাকে মানুষ ? বেঁচে লাভ ? তবে আমি দেশে গিয়েই মরতে চাই। বিদেশের জন্যে মরাটা কোনো কাজের কথা নয়।'

'যুদ্ধ কোথায় তোর দেশে ? যুদ্ধ ?' হর্ষবর্ধন ভারী খাপ্পা হয়ে ওঠেন এবার : 'যুদ্ধ কি বাধে, না, বেধেছে—এখনো সেখানে ?'

জবাব দিতে পারে না গোবরা। দাদার কথা মিথ্যে না। হর্ষবর্ধন আরো রাগ করেন : 'মরবার সুযোগই নেই স্বদেশে সেই এক হাসপাতাল ছাড়া। আর উনি মরতে চান স্বদেশে গিয়ে। ভারী ওঁর স্বদেশ !' হর্ষবর্ধন ঠোঁট বেঁকান।

স্বদেশের অপমানে গোবরার প্রাণে লাগে। সে বলে 'বিদেশে যুদ্ধে মরার চেয়ে স্বদেশে আত্মহত্যা করাও ভালো।'

'তবে যা, মরগে যা তুই স্বদেশে গিয়ে।' হর্ষবর্ধন শেষ জবাব দিয়ে দিয়েছেন। এখানে দাঁড়িয়ে আছিস কেন তবে ? স্বদেশেই চলে যা। আমি চাই না তোকে। আমি কিন্তু এখানেই মরবো। এই ইসপেনেই-- এই যুদ্ধেই, আলবৎ !' পুনশ্চ তিনি যোগ করছেন : 'এখানে গোলার মুখে মরতে কী মজা ! আঃ !' আরামে ওঁর চোখ বুজে এসেছে : 'মরবোই তো ! দেখি কে বাঁচায় আমায়- দেখি ?'

এরপর গোবরা একেবারেই চুপ মেরে গেছে- -আর কী বলবার আছে তার ? এর পর চালাতে হলে, নিতান্তই তাকে পা চালাতে হয়, কথা আর চলে না। কিন্তু এই পাঁচ হাজার মাইল দূর থেকে পায়ে হেঁটে, স্বদেশে যাওয়ার চেয়ে, যমের বাড়ী যাওয়া --এমন কি এই বৈদেশিক বিভ্রাটে বিজড়িত হয়ে হ্যাঁ, যমালয়ে যাওয়াও ঢের

সোজা। কাজেই দাদার সঙ্গে, এক যাত্রায় মৃত্যুমুখে পতিত হবার জন্যেই সে প্রস্তুত হয়েছে।

ভালো করে ভেবে দেখলে, মারা যাবার পর আর কিছুই বাকী থাকে না—না কোনো সমস্যা, না কোনো দুর্ভাবনা; প্রাণ গেলে আর থাকলো কী? তখন আর মাথা ব্যথা করে লাভ? কি জন্যে মরলুম, কার জন্যে মরলুম, কোথায় বা মরলুম—মরলুমই বা কেন—আদৌ মরলুম কিনা তাও জানবার উপায় নেই তখন! অতএব মরা নিয়েই হলো কথা—মারা গেলে কথাও চুকলো, কাজও খতম! তাছাড়া দেখতে গেলে, নিজের দেশের জন্যে প্রাণ সবাই দেয়, গরু-বাছুরেও—তারাও কিছু বিদেশে গিয়ে দেহত্যাগ করে না সে আর এমন বেশী কথা কি? কিন্তু বিদেশের জন্যে মরতে যায় কে? ক'টা যায়? এই কারণে, সমান মারাত্মক হয়েও, বিদেশের জন্য মরাটাই বেশী সার্থক - হর্ষবর্ধনের এই সার সিদ্ধান্ত, অনেক ভেবে-চিন্তে, সন্ধ্যা নাগাদ, নিঃসন্দেহে, পৌঁছে গেছে গোবরা।

যখন প্রাণ দেয়া নিয়ে মাথা ঘামাবার কিছুই থাকলো না, তখন ওরা দু'ভাই, নিশ্চিন্ত মনে, যুদ্ধক্ষেত্রের ইতস্ততঃ এধারে-ওধারে সর্বত্রই নিরুদ্বেগেই চরে বেড়াতে শুরু করে দিলো। দু-একটা গোলা-গুলি ছিটকে এসে, হাওয়ার ঝটকা মেরে সাঁ করে চলে যায় নাক-কানের ঠিক পাশ দিয়ে—গ্রাহ্যই করে না ওঁরা! মৃত্যুর সঙ্গে গায়ে পড়ে কোলাকুলি বাধাতেই যেন ব্যাকুল হয়ে বেরিয়ে পড়েছে ওরা।

'দূর, এমনি করে ঘাঁটি আগলে পড়ে থেকে কী লাভ?' হর্ষবর্ধন বলেন: 'কেবল বাজে সময় নষ্ট!'

গোবর্ধন অনুযোগ করে: 'ফ্রাঙ্কোর লোকেরা গালে হাত দিয়ে সব ভাবছে বোধহয় যে, কী করা যায় এখন!'

জেনারেল মশাই বোধহয় ভেবেছিলেন যে, উনি আসামাত্রই মাড্রিদের লোকরা দরজা খুলে সমাদরে ওঁকে অভ্যর্থনা করবে!

ম্যাড্রিড দখল করা ওসব ফ্রাঙ্কো-ট্রাঙ্কোর কর্ম না।' গোবর্ধন বলে, 'ম্যাডরাসই নিতে পারতো কিনা কে জানে, তা ম্যাডরিড!'

'রাসলীলাটা দেখা হলো না জীবনে'—হর্ষবর্ধন দুঃখ করেন—'পাগলদের রাসলীলা!'

'ম্যাডরিডে ঢুকতে পেলে অনেক কাণ্ড দেখতে পাবো, দাদা।' গোবর্ধন দাদাকে সান্ত্বনা দেয়—'রাসলীলার কম কিছু হবে না সে। ঢুকি তো একবার!'

'হাঁ, ঢুকতে পেলে তো।' হর্ষবর্ধনের ক্ষোভ যায় না। 'দু'দলে মিলে যা মৎলব এঁটেছে সেখানে, তাতে এরাও ঢুকছেনা—ওরাও পাচ্ছেনা ঢুকতে।'

'দু'দলের মধ্যে কোনো ষড়যন্ত্র হয়নি তো, দাদা?'

'বিচিত্র নয়!' হর্ষবর্ধন মাথা চালেন। 'হলেও হলো! জংলীদের মধ্যে সবকিছু হওয়াই সম্ভব। আশ্চর্য কি?'

'এক কাজ করা যাক, দাদা—' গোবর্ধন বলে: 'এসো, আমরা কাজে লাগি। এদের ষড়যন্ত্র ভেঙে দিইনা কেন?'

'কী করে শুনি?' হর্ষবর্ধন সামান্য উদগ্রীব হন।

'আমরা দু'জনেই এগিয়ে গিয়ে আক্রমণ করি না কেন? আমরা দু'জনেই তো ম্যাডরিড জয় করে ফেলতে পারি।'

'কুল্লে এই দু'জনে? তুই আর আমি—এই দুজনে?' হর্ষবর্ধনের সংশয় হয়—'দুজনে মিলেই ম্যাডরিড দখল করে নেবো, বলিস কি?'

'এমন আর কি অসম্ভব, দাদা? হনুমান যে একা একাই লঙ্কা জয় করেছিলো! আমরা পারবো না? কী যে বলো তুমি? তুমি—তুমি তো একাই একশ'! তাই নয় কী?'

হর্ষবর্ধন খুশি হয়ে বললেন, 'তা বটে! সে কথা বটে!' তিনি যে একাই একশ'র সমকক্ষ, সে বিষয়ে তো কোনোদিনই ওঁর কিছুমাত্র সন্দেহ ছিলো না।

'আর আমিও একশ'।' গোবরা বলে, 'ছ'জনে মিলে আমরা ছ'শ! নয় কি, ঘটনাটা?'

গোবরা—গোবরাজাতীয় একশ'র সমান, হলেও হতে পারে—কিন্তু একজন হর্ষবর্ধনেরও সমকক্ষ হওয়া সম্ভব নয়, কিছুতেই ওর পক্ষে—এই রকমই কুসংস্কার বদ্ধমূল ছিলো হর্ষবর্ধনের। সেই সনাতন ধারণা থেকে তাঁকে টলানো যায় না—তিনি প্রতিবাদ করতে যান।

গোবরা বলে: 'বেশ, কত হবে, আমরা দু'জনে মিলে? তুমিই বলো—একশ' পঁচানব্বই? না? একশ' আশী? তাও না? তবে কি একশ' পঞ্চাশ? এত কম?' গোবরার গলা ভারী হয়ে আসে।

'না না, তার বেশী—তারও বেশী।' ভাইয়ের মনে ব্যথা দিতে প্রাণে লাগে দাদার। ভাইকেও মনঃক্ষুণ্ণ করবেন না অথচ সত্যবাদীতার পরাকাষ্ঠাও হবেন এক ঢিলে দু'পাখী মারার মৎলব তাঁর। 'আরো কিছু ওঠ।' তিনি বলেন।

গোবরা আরো কিছু ওঠে: 'একশ' বাহাত্তর? আরো বেশী? একশ' বাষট্টি? আরো? পঁয়ষট্টি? হ্যাঁ—একশ' পঁয়ষট্টি? আরো বেশী বলছো? একশ' উনসত্তর?'

'একশ' বাহাত্তর হলেই ঠিক হবে।' চুলচেরা বিচার করে বলেন হর্ষবর্ধন। 'তুই আমার চেয়ে আটাশজন কম—সেই যথেষ্ট।'

সংখ্যার গোলমাল মিটলে আর শঙ্কার কিছু থাকেনা অতঃপর! প্রাণের ভয় তো ছিলোই না এঁদের—বিদেশের জন্যে জীবন দিতেই বেরিয়েছেন তবে আর পিছপা হবেন কেন, কার জন্যেই বা?

সন্ধ্যার মুখেই সেই একশ' বাহাত্তরজন, দুটি মাত্র বন্দুক কাঁধে, বেরিয়ে পড়েন মাদ্রিড আক্রমণে। বিজয় অভিযানে বীরবিক্রমে বেরিয়ে পড়েন—কারুর তোয়াক্কা করেন না।

হর্ষবর্ধনরা প্রবল পদ নিক্ষেপে যেদিক পানে অগ্রসর হন, সেদিকটার মোহড়া নিয়েছিলেন লা-পাসানোরিয়া। স্পেনীয় এই মেয়ে

সেনাপতির নাম খবরের কাগজের দৌলতে তোমরা শুনেছো বোধ করি। অতি আধুনিক এই সংগ্রামে মেয়েরাও যে সমারোহে যোগদান করেছে এই সংবাদও তোমাদের অজানা নয় নিশ্চয়।

লা পাসানোরিয়া! এই নামে পাষাণেরও হিয়া বিক্ষুব্ধ হয়। অবশ্য হর্ষবর্ধনদের বিচলিত হবার ছিলো না কিছু। ও-নামের লেশমাত্রও তাঁদের কানে প্রবেশ করেনি কোনোদিন। জানা তো দূরের কথা।

জেনারেল ফ্রাঙ্কো পর্যন্ত যাঁর সম্মুখীন হতে সহজে রাজি হতেন কিনা সন্দেহ, অসমসাহসী ও অসহায়, সেই একশ' বাহাত্তরজন বীরপুরুষ, বিকল্পে ওরা দু'ভাই, একেবারে সোজাসুজি, তাঁরই হুদ্দায় গিয়ে হাজির হয়।

'ঢ্যাখো দাদা ঢ্যাখো—!' গোবর্ধন দাদার দৃষ্টি আকর্ষণ করে—ঐ গর্তগুলোর ধারে—বস্তাগুলোর আড়ালে মেয়েরা নয় সব?

'দূর!' না দেখেই হেসে উড়িয়ে দিলেন হর্ষবর্ধন; মেয়েরা কেন মরতে আসবে যুদ্ধে? পাগল হয়নি তো তারা! 'কিন্তু দেখামাত্রই ওঁর চক্ষু ছানাবড়া হয়: 'অ্যাঁ, তাইতো! মেয়েরাই তো ...সৈন্য সেজেছে দেখছি...তাজ্জব!...'

এবং সঙ্গে সঙ্গে দুর্দৈবক্রমে মেয়েরাও তাঁদের দেখতে পায়। এবং দেখতে না দেখতে ঘেরাও করে ফেলে।

চারিদিকেই খাড়া-করা বন্দুক, প্রত্যেক মেয়ের হাতেই, এবং খুব সম্ভব এয়ার গান নয় হর্ষবর্ধন লক্ষ্য করেন। আসল দন্তুর বলেই তাঁর সন্দেহ হয়। এবং যেটুকু সংশয়ও বা ছিলো, একজনের হাতে আচমকা সঙীনের একটা খোঁচা খেয়ে, মুহূর্তেই তা উপে যায়।

হর্ষবর্ধন আর্তনাদ করে ওঠেন। জীবনে সঙীন ব্যাপারের সম্মুখীন তিনি এই প্রথম—এ-সব খাদ্যের সঙ্গে তো তাঁর পরিচয় ছিলো না এর আগে, কল্পনাও করতে পারেন নি কোনোদিন।

'খুব লেগেছে নাকি, দাদা?' জিগ্যেস করে গোবরা!

'দূর, লাগবে কি? লাগে নাকি কখনো?' যন্ত্রণায় মুখ বিকৃত করে হর্ষবর্ধন বলেন; 'লাগবার কী আছে ওতে? আর যুদ্ধ করতে গেলে এমন একটু আধটু লাগে। লেগেই যায়, তাতে কি?'

গোবর্ধন প্রবোধ মানেনা, যে মেয়েটি দাদাকে গুঁতিয়েছিলো তার দিকে বন্দুক ওঁচায়।

ব্যস্ত হয়ে বাধা দেন হর্ষবর্ধন: 'আরে আরে, মেয়েছেলে যে!'

'মেয়েছেলে না হাতী!' গোবরা তখন ক্ষেপে গেছে, 'মেয়েমানুষের বাবা ওরা—পাপ নেই ওদের মারলে।'

'ছিঃ, গোবরা—আমরা তো এদের মতো জংলী নই, আমরা আর্য সন্তান, সনাতন কাল থেকে সুসভ্য, মেয়েদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরতে নেই আমাদের। নইলে আমিই কি মারতে পারতুম না? আমার কি বন্দুক নেই? যুদ্ধ করতেই তো বেরিয়েছি!'

গোবর্ধন হাত নামায়—'আচ্ছা, গুলি যদি না করি, শুধু বন্দুক দিয়ে পিটি—পিটে দিই কেবল—তাহলে?'

'তাহলেও দোষ। আমরা আর্যরা মেয়েদের সামনে একেবারে নিরস্ত্র।' এই বলে হর্ষবর্ধন নিজের বন্দুক ছুঁড়ে ফেলে দেন দূরে। 'ওরা যদি মেয়ে না হয়ে নিছক গরুও হতো, তাহলেও তাই করতাম। গরুদের সঙ্গে আর্যরা কখনো যুদ্ধ করে না।'

'পেরে ওঠে না, তাই।' গোবর্ধন গজরায়—'গুঁতিয়ে দেয় পাছে, সেই ভয়ে।'

'কেন, পড়িসনি রামায়ণে?' হর্ষবর্ধন স্মৃতিশক্তির সাহায্যে পুরাতন পঙ্কোদ্ধার করেন:

'মকরাক্ষ এসেছিলো বুদ্ধি বড়ো সরু।'

'রথে বেঁধে এনেছিলো তিন জোড়া গরু। ফল হলো কি না, রামচন্দ্র বাণ ছুঁড়তেই পারলেন না।'

'সোজা পিটটান দিলেন?'

'কী করলেন মনে নেই। তবে গো-হত্যা করেন নি ঠিকই। তাহলে লিখতো রামায়ণে।'

অগত্যা গোবর্ধনকেও বন্দুক ফেলে দিতে হয়। তখন পাষাণ-হৃদয়া, লা-পাসানোরিয়ার দলবল ওঁদের বন্দী করে নিয়ে যায়।

* * *

ভেতরে গিয়ে হর্ষবর্ধনরা দেখেন, তাঁদের দলের আরো কয়েক-জন ধৃত হয়ে রয়েছে সেখানে। কতিপয় ইতালীয় ও জার্মান মেয়ের হেফাজতেই রয়েছে।

জিজ্ঞাসাবাদে জানতে পারেন, কোর্ট মার্শালের প্রতীক্ষা করছে তারা। কেবল হর্ষবর্ধনের অপেক্ষাতেই ছিলো--রাত্রি আরো কিঞ্চিৎ ঘনীভূত হলে তাদের সবার বিচার একসঙ্গেই শুরু হবে।

'কোর্ট মার্শাল কী, দাদা?' গোবর্ধন প্রশ্ন করে।

হর্ষবর্ধন তাঁর যৎসামান্য ইংরিজির সাহায্যেই বন্দীদের কাছ থেকে বার করে নিয়ে গোবরার কৌতূহল চরিতার্থ করেন, 'এরা বলছে যে, সরাসরি সামরিক বিচার, তার আইন নেই, কি ফাইন নেই---একেবারে সোজাসুজি প্রাণদণ্ড।'

'য়্যাঁ, ঝুলিয়ে দেবে নাকি! বলো কি দাদা?'

'উঁহু। ফাঁসি নয়—ভয় নেই তোর—' হর্ষবর্ধন আশ্বাস দেন: 'এরা বলছে যে, গুলি করে মারবে।'

গোবর্ধন বিশেষ ভরসা পায় না!

হর্ষবর্ধন বলেন: 'বিশ্বাস হয়না, আমার। মেয়েরা কখনো গুলি করতে পারে? ছুঁড়তে পারে বন্দুক? পাগল, উল্টে পড়ে যাবে যে!'

'তবে—তবে কোর্ট মার্শাল বলছে যে!'

'সেকি পুরুষদের মতো সেই ধরনের হবে? এদের কোর্ট মার্শাল নিশ্চয় আলাদা রকমের!' হর্ষবর্ধন ব্যক্ত করেন: 'হয়তো কোর্টশিপের মতো হতে পারে। সেও তো মেয়েদের কাণ্ড!

'কোর্টশিপ আর কোর্ট মার্শাল কি এক হলো, দাদা?'

'নয় কেন? তাতেও আদালত আছে, এতেও আদালত। কোর্ট মানেই তো আদালত? তবে ওতে হচ্ছে ছাগল নিয়ে টানাটানি।'

গোবরা বাধা দেয় 'উঁহু। শিপ মানে ভেড়া, ছাগল না।'

'বেশ ভেড়াই হলো, ও একই কথা।' হর্ষবর্ধন মেনে নেন। 'ভেড়া আর ছাগল কি আলাদা? দু'জনেই সমান সুখাদ্য—'

'তা বটে। পায়ের সংখ্যা, শিং এবং আওয়াজ প্রায় সমান।'

হর্ষবর্ধন তাঁর গবেষণাটা সমাপ্ত করেন—'কোর্টশিপে হলো গে ভেড়া দিয়ে টানাটানি, আর এটাতে, এটাতে—' তাঁর আমতা আমতা আরম্ভ হয়—'প্রাণ নিয়েই টানাটানি কিনা, কে জানে।'

কোর্ট মার্শাল শুরু হয়ে যায় ততক্ষণে। মুহূর্তের মধ্যে একজন জার্মানের প্রাণদণ্ডের হুকুম জারি হয়।

তারপর সে বেচারীকে তো নিয়ে গিয়ে দাঁড় করানো হয় দু'জন বন্দুক-ধারিণীর সামনে। সে কি দাঁড়াতে চায় সহজে? মেয়েছেলের সামনে দাঁড়াতে তার লজ্জা করে, তাদের হাতে মারা যেতে কেমন সঙ্কোচ হয়। বার বার তাকে খাড়া করা হয়, সে বসে পড়ে।

তখন কোর্ট মার্শালের দ্বিতীয় হুকুম জারি হয়; 'আচ্ছা, আয়েস করেই মরতে দাও ওকে। বসেই দেহরক্ষা করুক!'

প্রহরিণীদের দু'জনেই বন্দুক ছোঁড়ে, প্রথমে আলাদা আলাদা, তারপরে যুগপৎ, তারপরে যদৃচ্ছাক্রমে কিন্তু ত্রিশ-বত্রিশবার গুলি বৃষ্টির পরেও, লোকটা ঠায় বসে থাকে। একটাও গুলির ছোঁয়াচ লাগে না তার গায়ে!

প্রথমে বেচারীর চোখ কপালে উঠে গেছলো। এখন ক্রমশঃ ওর মুখে হাসির আভাস দেখা যায়—সলজ্জ হাসি। সে এবার হাত-পা ছড়িয়ে ভালো হয়েই বসে—তোফা আরাম করেই। বিনা পয়সায় ম্যাজিক দেখছে যেন।

হর্ষবর্ধন এতক্ষণে রুদ্ধ নিশ্বাস পরিত্যাগ করেন। গোবর্ধনও হাঁপ ছাড়ে! 'ওঃ, এই এদের কোর্ট মার্শাল!'

'তখনই বলেছি আমি, বন্দুকের কর্ম না, মেয়েদের।' হর্ষবর্ধন বলেন, 'অস্ত্র ওদের ধর্তব্যই নয়! হাতা কি খুন্তি হলে ভয় ছিলো বটে। মেরে ফেলতো এতক্ষণে! খুঁচিয়েই মেরে ফেলতো।'

বন্দুক ধারিণীদের এবার অবসর দেওয়া হয়। ষণ্ডা-গোছের দুটি মেয়ে এগিয়ে আসে অতঃপর। মৃত্যুদণ্ডিত মৃত্যুহাস্যপরায়ণকে গ্রেপ্তার করে, কাছাকাছি একটা বাড়ীর গাত্র সংলগ্ন স্পাইরাল সিঁড়ি বেয়ে টেনে নিয়ে চলে—সেই বাড়ীরই তিন তলায়!

ওরা দু-ভাই অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে—এ আবার কি রহস্য? কোর্ট মার্শালের পালা শেষ হয়ে কোর্টশিপের পালা শুরু হলো নাকি এবার? হর্ষবর্ধন মাথা ঘামান।

সেই বাড়ীটাই সেখানে কাছাকাছি এবং একমাত্র বাড়ী। যে স্থলে মারাত্মক আদালতটা বসেছিলো, সেটা শহরের প্রান্তসীমায়। প্রায় মিলিটারী ঘাঁটির মধ্যেই। তার চারধারের বাড়ীঘর বোমার কুদরতে খুব কমই আস্ত ছিলো। এই বাড়ীটিই কেবল বিধ্বস্ত হতে হতে বেঁচে গেছে কোনক্রমে। লা-পাসানোরিয়ার ঘাঁটিওয়ালিদের আস্তানা হয়েছিলো তাই এখানেই!

বাড়ীটার পাশেই, ট্রেঞ্চের মধ্যে দিয়ে, সামরিক উদ্দেশ্যে খাল কাটা হয়েছিলো—দুর্দমনীয় জলস্রোত সেই খালে।

গোবর্ধন সেইদিকে ভ্রূক্ষেপ করে: 'হাত-পা বেঁধে ওই খালে ফেলে দিলেই পারে। এক্ষুণি ল্যাটা চোকে।'

হর্ষবর্ধন ভাইয়ের মুখ চাপা দেন: 'ওদের আর বুদ্ধি বাৎলাসনি, গোবরা! জলে ডুবে মরতে ভারি ভয় হয় হর্ষবর্ধনের। মারা যাবার যাবতীয় প্রণালীর মধ্যে ওতেই ওঁর সব চেয়ে বেশী অরুচি।

'হ্যাঁ, ওরা আবার বুঝবে!' গোবরা বলে।

'বুঝতে কতক্ষণ? যদি ওদের ইংরিজি বোঝাতে পারি—স্পেনীয়দের ইংরিজি হর্ষবর্ধনের কাছে, উড়েদের কাছে বাঙালীর হিন্দি বাৎচিতের মতোই জলবৎ-তরলং। 'আর ওরা বুঝবে না আমাদের বোলচাল? কি যে বলিস!'

ততক্ষণে জার্মানটাকে নিয়ে ওরা দাঁড় করিয়েছে তেতলার খোলা বারান্দায়। বারান্দাটা যেন ঠেলে বেরিয়ে এসেছিলো বাড়ী থেকে—যেমন অদ্ভুত বাড়ী, তেমনি তার সিঁড়ি!

দুই ভাই ঊর্ধ্বমুখে, উৎসুক চোখে তাকিয়ে দেখেন—জার্মানটাকে ওরা বারান্দার কিনারায় টেনে এনে ধাক্কিয়ে দেয় একদম নীচের দিকে। নীচের অন্ধকার খাবিহায়ার মধ্যে। অধঃপতনের মুখে ঠেলে দেয় একদম।

চরম মুহূর্তে এসে জার্মানটা জানতে পারে যে, তার চূড়ান্ত মুহূর্ত সন্নিকট। কিন্তু এক মুহূর্তেই সে প্রস্তুত হয়ে নেয়। এতক্ষণ সে আপন মনেই একটু হাসছিলো, কিন্তু হাসিটা আপাততঃ স্থগিত রাখে। ওপর থেকে পড়তে পড়তেই বলে—'হেইল হ্যাটলার!' শূণ্যমার্গেই বলে। বলতে বলতেই পড়ে। আর যেমনি তার ভূমিসাৎ হওয়া, অমনি সে ছাতু। তৎক্ষণাৎ।

এইভাবে আরো ক'জন জার্মান ও ইতালীয়কে কোতল করা হয়, পরবর্তীরা কিন্তু সহজে আত্মসমর্পণ করে না। সহাস্যমুখে তো নয়ই! বীরপুরুষের মতোই দারুণ ধ্বস্তাধ্বস্তি বাধিয়ে দেয়। এখন আরো বেশী মেয়ে এসে লাগে। একাধিক ক্ষুদে পিঁপড়ে একটা বিপুল দেহ পিঁপড়েকে যেভাবে বিদেহ করে—অবিকল সেই সিসটেমে—কেউ হাত, কেউ পা, কেউ ঘাড়, কেউ বা কান ধরে—অর্থাৎ সকলে মিলে ধরাধরি করে টেনে হিঁচড়ে প্রত্যেক বন্দীবরকে বধ্য-ভূমিতে উত্তোলিত করে। প্রায় চ্যাংদোলায় তুলিয়েই ছুঁড়ে দেয় তাদের। হেইল হিটলার হাঁকবারও ফুরসৎ পায় না অনেকে।

এগুলো ঠিক যেন কোর্টশিপের নিয়মসঙ্গত হচ্ছে না, হর্ষবর্ধনের কেমন যেন সন্দেহ হতে থাকে।

কিন্তু বেশীক্ষণ মাথা ঘামানোর অবকাশ তিনি একেবারেই পেলেন না। তাঁরও তলব এসে পড়ে। চারজন ষণ্ডা গোছের মেয়ে এসে পাকড়াও করে তাঁকে, হর্ষবর্ধন টের পেলেন যে, তাঁরও আশু উন্নতি আসন্ন—এবং তারপরেই নিদারুণ অবনতি—একেবারে গতাসু হবার ধাক্কাই বলতে পারা যায়।

হর্ষবর্ধন আর্যসন্তান, মৃত্যুর সামনে সহজে ভীত হবার পাত্র নন। প্রথম জার্মানটার মতো অতখানি হাসি তাঁর পায় না। তবু ঈষৎ হাসবার তিনি প্রয়াস পান। তাঁকে পাঁজাকোলা করবার উপক্রম করতেই তিনি হাত নেড়ে বাধা দেন: 'উঁহু। আমরা আর্যসন্তান, এমনিই আমি যাবো। না সাধতেই। আমাদের পুনর্জন্ম আছে, ভয় খাইনে আমরা।' হর্ষবর্ধন উঠে পড়েন—'চললাম গোবরা।'

'পিছনেই আছি, দাদা।' গোবরা বলে। 'আমিও যাচ্ছি সঙ্গে।' তাকে কেউ ডাকে না—এখনো প্রাণদণ্ড হয়নি তার—তবু সে দাদার অনুসরণ করে বিনা-নিমন্ত্রণেই।

গীতার শ্লোক আওড়াতে আওড়াতে দাদা অগ্রসর হন: 'যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত:। অভ্যুৎ—অভ্যুৎ'—উত্থানের কাছাকাছি এসে আটকে যায় হর্ষবর্ধনের। বারম্বার আটকে যায়।

'মাতৃবৎ পরদারেষু পরদ্রব্যেষু লোষ্ট্রবৎ।'—গোবরা বলে।

'উঁহু-উঁহু।' ঘাড় নাড়েন হর্ষবর্ধন।

'শরীরমাদ্যম্ খলুধর্মসাধনম্?' গোবরার জিজ্ঞাস্য হয়।

'উঁহু-উঁহু।' হর্ষবর্ধন ভারী বিরক্ত হন এবার—'খলু ধর্মও না, কলু ধর্মও না, আসল ভগবানের বাণী—চারটিখানি কি?' পুনরায় তিনি চেষ্টা করেন: 'গ্লানির্ভবতি ভারত—অভ্যুৎ—অভ্যুৎ—'

'ভগবানের কথার মধ্যে আবার ভূত কেন, দাদা? ভূত কি

'ভগবানের চেয়ে বড়ো?' গোবরা নিজেই নিজের প্রশ্নের সদুত্তর দেয় তক্ষুনি: 'তা হবে হয়তো। ভগবানের চেয়ে ভূতেরই তো ভয় বেশী—'

'হয়েছে—হয়েছে।' থাতিয়ে ওঠেন হর্ষবর্ধন—ভূতের আলোচনায় তাঁর মনে পড়ে যায় হঠাৎ!—"যদা যদাহি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারতঃ। আত্মবৎ সর্বভূতেষু তদাত্মানম্ সৃজাম্যহম্।" হ্যাঁ, এবার ঠিক হয়েছে।' গোবরাও উৎসাহ পায়—'সমসকৃত সমসকৃত শোনাচ্ছে ঠিক।'

'আমি আবার নিজেকে সৃষ্টি করবো—কিছুতেই মারা পড়ে থাকবো না—বুঝেছিস গোবরা!' হর্ষবর্ধন গুরুতর কণ্ঠে ঘোষণা করেন: 'শাস্তরের কথা! ঐ শোলোকেই বলে দিয়েছে। এতখানি অনাসৃষ্টি বরদাস্ত করতে পারবো না আমি। কিছুতেই না। হুস্!'

'তাই করো, দাদা।' করুণ কণ্ঠে বলে গোবরা—'তবে সৃষ্টির সময়ে আমাকেও যেন বাদ দিয়ো না, দাদা! তোমাকে ছেড়ে থাকতে পারবো না।' গাবরার গলা ভার ভার! 'ভুলে যেয়ো না, আমায়!'

আগে-পিছে মেয়ে বডিগার্ড—সব পেছনে গোবর্ধন—সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে হর্ষবর্ধনের মনে হতে থাকে, আহা, কেউ যদি, বারান্দার ঠিক নীচেটাতেই একটা লম্বা বোম্বাই চাদর বিছিয়ে টেনে ধরতো—তাহলে তিনি অনায়াসেই লাফাতে পারতেন হাড়গোড়ের মায়া না রেখেই, প্রাণদণ্ডের থোড়াই কেয়ার করে, হাত-পা ছেড়ে দিয়েই লাফাবেন, অনায়াসেই, অসঙ্কোচেই, এমনকি, দারুণ উৎসাহের সঙ্গেই তিনি লাফাতেন—যতবার বলতো ততবারই। কিন্তু হায়, হর্ষবর্ধনের দীর্ঘ নিশ্বাস পড়ে, কোথায় এখন বোম্বাই চাদর, আর কেই বা টেনে ধরছে। আর পতনশীল হর্ষবর্ধনকে সামলানো একা গোবর্ধনের কর্ম না। তবে হ্যাঁ, তাঁর না হয়ে যদি গোবরার কক্ষ-দণ্ড হতো, তাহলে তিনি কেবল উর্ধ্ববাহু হয়েই, গোবর্ধনকে ধারণ করতে পারতেন, চাদরের প্রয়োজনই হতো না, রসগোল্লার মতোই হর্ষবর্ধন লুফে নিতেন ওকে!

হর্ষবর্ধন বারান্দার কিনারায় গিয়ে দাঁড়ান, তাকান নীচের দিকে একবার—মনে মনে নীচতার পরিমাপ করেন। না, এখান থেকে আছাড় খেলে নিতান্তই দাদৃহারা হতে হবে, গোবরাকে। একান্তই পুনর্জন্মের ধাক্কা! নির্ঘাৎ।

উনি প্রস্তুত হন। শেষ চীৎকার ছাড়েন, সেই প্রথম জার্মানটার মতো—মরতে হলে বীরের মতো মরাই বাঞ্ছনীয়!

'হেই—হেই—হেই.........'

চূড়ান্ত মুহূর্তে চরম বাক্যটা আর মনে পড়েনা তাঁর। 'ঐ যাঃ, ভুলে গেছি—কী লোকটার নাম রে? ঐ যা বলে চ্যাঁচায় রে!'

গোবরাও ভুলে মেরেছে। আশ্চর্য নয়, এরকম অবস্থায় বাপের নামই ভুলে যায় মানুষ। নিজের নামই মনে রাখতে পারে না।

'তখনই বললাম তোকে মুখস্ত করে রাখতে।'

'আর মুখস্ত করে কী হবে, দাদা? এরা তো ও নাম মানবে না, এরা যে তার উলটো দল—'

'তা হোক! মুখ বুজে বেড়ালের মতো মারা যাবো, সেটা কি ভালো? বীরের মতো মরছি যে, এদের সেটা জানান দিতে হবে।'

গোবর্ধন মাথা চুলকোয় দাদার পিছনে দাঁড়িয়ে।

হর্ষবর্ধন এতক্ষণের পর যেন একটু আলো দেখেন 'হ্যাঁ হ্যাঁ, মনে পড়েছে। কথাটার শেষের আধখানা হচ্ছে 'লার্'—এখন আগের আধখানা হলেই সব ঠিক হয়ে যায়। ঐ যে, ওরা সব মাথায় পরে রে—সাহেব-মেমরা পরে। বল্ না গোবরা।' হর্ষবর্ধন হ্যাট কথাটাকেই মনের মধ্যে হাতড়ান।

'মাথায় পড়ে?' গোবরা মাথা ঘামায়। 'মাথায় আবার কী পড়ে? বাজ? বৃষ্টি? বোমা? তা নয়?—তবে কি কেবল কাকের গু নাকি? উঁহু? কম্ফর্টার; পাগড়ী? সে তো মাথায় বাঁধে সবাই। পড়ে বলছো? তাহলে কি ইঁট?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, এইবার হয়েছে—হে-হে-হেল্ ইটলার।' হর্ষবর্ধন লাফাবার জন্যে লাফিয়ে ওঠেন। 'হেইল্—'

গোবর্ধনের খটকা লাগে: 'দাদা, মরবার সময়ে আর বিলিতি দেবতা কেন? আমাদের দিশী দেবতা কি নেই?'

'এ তো কোনো দেবতা নয়—অবতার কেবল!'

'আমাদের দিশী অবতার কি নেই—কেন, মহাত্মা গান্ধী?'

কথাটা দাদার মনে লাগে, সত্যিই তো, আর্যসন্তান তিনি, অনার্য অবতারের নাম কেন তাঁর মুখে? মরতে হয়তো বলবো গান্ধীজী কি জয়! মহাত্মা গান্ধী-!

গোবরা ফোঁপাতে শুরু করে: 'দাদা। দাদা গো—'

'ছি, গোবরা; কাঁদে না, ছি।'

'ডাকবো তোমায় সেই বলে?—যা বলেছিলে তুমি?' দাদার শেষ বাসনাটাই বা কেন অপূর্ণ থাকে? গোবরা কাঁদতে কাঁদতেই চেঁচায়—'হেই হাবাড়ডান্!'

হর্ষবর্ধনও কেঁদে ফেলেন, তার গলা ফেটে আর্তনাদের সুর বের হয়: 'গান্ধীজী-কি জয়!' এবং প্রায় লাফিয়ে পড়েন তিনি।

এমন সময়ে বডিগার্ডরা, পিছন থেকে এসে চেপে ধরে তাঁকে—'ষ্টপ ষ্টপ। আর ইউ ইণ্ডিয়ান? নট নিগ্রো?'

বাধা পেয়ে ভড়কে যান হর্ষবর্ধন।

'আর ইউ গান্ধীষ্ট? আর ইউ হিণ্ডুজ?'

গোবর্ধন বলে—'অফ কোর্স!'

'দেন্ ডোণ্ট জাম্প! গো অ্যাওয়ে! ফ্রি ইউ আর!'

দু' ভাইকে ওরা বহিষ্কৃত করে দেয়—নগরের বাইরে। সেই রাত্রেই। চারিদিকে খানা-খন্দ, ট্রেঞ্চ, আর কাটা খাল—অন্ধকারে কোথায় পা বাড়াবেন? অগত্যা, গোবর্ধন চাপে একগাছে, আর এক গাছে হর্ষবর্ধন তাঁর দেহভার রক্ষা করেন। রাতটা কাটাতে হবে এই

যাবেই। হর্ষবর্ধনের গাছটায় হেলান দেবার সুবিধা ছিলো। ওরই ফাঁকের মধ্যে কাৎ হয়ে, কাক-নিদ্রার সুযোগে, মাঝে মাঝে দুঃস্বপ্ন দেখছিলেন তিনি।

একবার দেখলেন, তিনি খুব বুড়িয়ে গেছেন, যেন মহাবৃদ্ধ পিতামহ যার কি? আর গোবরা গেছে নেহাৎ বাচ্চা বনে—সেই বাল্যকালের সেকেলে গোবরাটি যেন!

জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সম-পিতা হয়ে গোবর্ধনকে তিনি সম্বোধন করছেন: বৎস, গোবরা! যুদ্ধ-বিগ্রহে কাজ নেই, ফিরে যা তুই! তোর দেশাই ঠিক! মরবার পক্ষে স্বদেশই ভালো। এমন কি, বাঁচবার পক্ষেও খুব মন্দ না।'

আর একবার দেখলেন, গোবরার বৌদিকে। তিনি যেন সিংহাসনে বসে রাণী সেজে কোর্ট মার্শাল করছেন, লা-পাসানোরিয়ার মতোই—আর তাঁর ঠিক পেছনেই দাঁড়িয়ে পাগড়ী-বাঁধা কে ঐ লোকটা? জেনারেল ফ্রাঙ্কোই যেন স্বয়ং? কি সর্বনাশ!

এবার হর্ষবর্ধনের এমন চমক লাগে যে, গাছ থেকে প্রায় পড়ে যান আর কি! ঘুম ভেঙেই তিনি চোখ কচলে তাকান চারিদিকে। নাঃ, দুঃস্বপ্নই। তবু রক্ষা; আরামের নিশ্বাস পড়ে ওঁর। কিন্তু ওটা কি তাঁর সামনে—ঐ মাটিতে পড়ে রয়েছে যেটা? বেশ চোখ কটমটিয়ে তাকিয়ে আছে তাঁর দিকে?

কোনো বোমা-টোমা নয় তো? এখানে এবং এখুনিই ফাটে যদি, তাহলেই তো সাবাড় করেছে; তিনি এবং তাঁর ভ্রাতা—দু'জনেই একেবারে কাবার তাহলে।

হর্ষবর্ধন আস্তে আস্তে গাছ থেকে নামেন। ওটাকে নিরাপদ ব্যবধানে ছুঁড়ে ফেলাই ভালো। অমন করে চোখ পাকিয়ে, অত কাছাকাছি ওটা থাকাতে ওঁর স্বস্তি নেই।

হর্ষবর্ধন নেমে ওটাকে ধরে যতখানি হাতের জোর ছিলো, সব

দিয়ে যত সুদূরে সম্ভব ওটাকে বিদূরিত করে আবার গাছের ডালে এসে বসেন। নিরাপদে।

এদিকে জেনারেল ফ্রাঙ্কো সেই রাত্রেই ম্যাড্রিড দখলের মৎলব করছিলেন। তিনি গুটি-সুটি মেরে অগ্রসর হচ্ছিলেন সদলবলে—আচমকা ম্যাড্রিডের ঘাড়ে লাফিয়ে পড়বেন, এই দুরভিসন্ধি। হর্ষবর্ধন যখন গাছ থেকে নেমে হাতের জোর ফলাচ্ছিলেন, সেই মুহূর্তে তারা তাঁর একশ' হাতের মধ্যে তাঁর হাতের কসরতের কাছাকাছি—কাছিয়ে এসেছিলো।

এবং হর্ষবর্ধন যাকে বোমা মনে করে বিতাড়িত করলেন, সেটা আর কিছু না, প্রকাণ্ড এক বোলতার চাক—

চাক-ভাঙা বোলতার দল ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়লো গিয়ে জেনারেল ফ্রাঙ্কোর দলে। তার পরেই বাধলো বিভ্রাট।

গৃহ-হারা হয়ে ভীষণ ক্ষেপে গেল বোলতারা, কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞানলোপ পেলো তাদের, যাকে তাকে কামড়াতে শুরু করে দিলো তারা। যাকে সামনে পেলো তাকেই হুল দিয়ে বিঁধতে লাগলো। অসঙ্কোচেই।

জেনারেল ফ্রাঙ্কো সসৈন্যে বিচলিত হয়ে পড়লেন একেবারে। এক মুহূর্তেই। চোখে দেখা যায় না, গুলি করে ঠেকানোতো যায়ই না—অথচ সঙ্গীন দিয়ে বিঁধছে- এসব কোন্ শত্রু? আর কি ভীষণ জ্বলুনি তাদের কামড়ে।

সৈন্যরা সব লাফাতে শুরু করলো। বন্দুক-টন্দুক ফেলেই। এমন কি, জেনারেল বলে ফ্রাঙ্কোকেও রেয়াৎ করলো না বোলতারা। গোটা গোটা সত্তর সেঁদিয়ে পড়লো তাঁর প্যান্টের ভেতরে। তাঁকেই দলের গোদা বলে কি করে যেন জেনেছিলো তারা। ফ্রাঙ্কো চেঁচাতে শুরু করলেন. ফ্র্যাঙ্কলিই তিনি বললেন—'বোলতাদের সঙ্গে লড়াই করা আমার সাধ্য না। ম্যাড্রিড মাথায় থাক, আমি আর এর ত্রিসীমানাতেও নেই।

যুদ্ধে গেলেন হর্ষবর্ধন

জেনারেল ফ্রাঙ্কো পিটটান দিলেন। সসৈন্যে—সেই দণ্ডেই। প্রায় পঞ্চাশ মাইল তাদের তাড়িয়ে নিয়ে রেখে এলো বোলতারা, তারপর ক্লান্ত হয়ে পড়লো তারা—কামড়ে কামড়ে দাঁত ব্যথা—হুল ভোঁতা হয়ে গেল তাদের। জেনারেল ফ্রাঙ্কো তখনো অক্লান্ত ছুটছেন। সদলবলেই বীরদর্পেই।

উনিশ-শো সাঁইত্রিশ সালে, একদা, জেনারেল ফ্রাঙ্কো, সসৈন্যে, ম্যাড্রিড অবরোধ করে, বিনা বিরোধেই বহুদূরে সরে পড়েছিলেন, খবরের কাগজের মারফতে এ খবর তোমরা পেয়েছো। কিন্তু তাঁর এই অভাবিত সুদূর গতির মূলে যে কী দুর্গতি ছিলো এবং সেই দুর্গতির মূলে হর্ষবর্ধনের অবদান যে কতখানি, তা তোমরা জানতে পারলে বোধহয় এতদিনে।

ফ্রাঙ্কোর বিরাট পলায়নের কীর্তি পরদিনই জানলো ম্যাড্রিডবাসী, কারণটাও টের পেলো ক্রমশঃ! তারপর অচিরেই একদিন হর্ষবর্ধনকেও আবিষ্কার করলো তারা। আর কী অভিনন্দনটাই না দিলো তাঁকে। গোবর্ধনও বাদ গেলনা, বলাই বাহুল্য। স্বয়ং রিপাবলিকের প্রেসিডেন্ট হর্ষবর্ধনের করমর্দনে পুলকিত হবার জন্যে হাত বাড়ালেন—তাঁর নিজের প্রাসাদে তাঁকে নিমন্ত্রণ করে এনে—।

কিন্তু সে আর এক গল্প।

হর্ষবর্ধন এবং ষাঁড়

পাগলা ষাঁড়ের হাত থেকে আত্মরক্ষার একটা উপায় প্রায়ই বাৎলাতেন সনাতন খুড়ো। উপায়টি নির্ঘাৎ তাঁরই যে আবিষ্কার করা তা ঠিক বলা যায় না। আসলে তা এক সুপ্রাচীন দার্শনিক সিদ্ধান্ত। প্রবীন সেই ভূয়োদর্শী নাকি বলে গেছেন, ষাঁড় ক্ষেপে তাড়া করে এলে পালিয়ো না, কি মূর্ছিত হয়ে পড়ো না। বিচলিত হবার কিছু নেই, সামনে দাঁড়িয়ে ষাঁড়কে তাড়া করবারও দরকার নেই। অটলভাবে তার সামনে দাঁড়িয়ে তাকে বক দেখাবে। তাহলেই, অবশ্য কি হেতু বলা কঠিন—তৎক্ষণাৎ লজ্জিত হয়ে ফিরে যাবে ষাঁড়। অধোবদনে চলে যাবে।

অর্থাৎ যদি কথোপকথনের স্থলে তত্ত্বটা আমরা উদ্‌ঘাটিত করতে চাই তা হলে এই দাঁড়ায়:

পাগলা ষাঁড়ের হাত থেকে বাঁচতে চাও?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

কেন সে উপায় তো তোমার নিজের হাতেই!

তবু সনাতন কাল থেকেই, সব্বাই, ষাঁড়ের দ্বারা তাড়িত হয়ে, হাতের চেয়ে পায়ের ওপরই বেশী নির্ভর করে এসেছে। হর্ষবর্ধনরাও, কিন্তু আজ যে কী দুর্মতি হলো শ্রীহর্ষের। শ্রীমান গোবর্ধনের প্ররোচনায় সে সনাতন মতে আস্থাবান হয়ে পড়লো, আর তার ফলে যে ব্যতিক্রম ঘটে গেল, ষড়্‌দর্শনে বা ষাঁড়দর্শনে তার কী ব্যাখ্যা দেয় জানি না, কিন্তু প্রত্যক্ষদর্শনে তা খুব রোমাঞ্চকর।

গোড়া থেকেই তাহলে বলা যাক ব্যাপারটা:

কোথায় নাকি যাত্রা হচ্ছে বা হবার কথা হচ্ছে, তার খবর পেয়ে,

জবর করে জানবার জন্যে দু'ভাইয়ে বেরিয়েছিলেন। কিন্তু পাঁজি দেখে বোধহয় যাত্রা করা হয়নি, ফুটপাথে পদক্ষেপ করে কয়েক পা না এগোতেই হর্ষবর্ধন হঠাৎ গোবর্ধনের গায়ে অনেকটা ঢলে পড়লেন। অনেকটা পদ্মার ঢলুনির মতোই, আশপাশের কারোর তাতে খাড়া থাকবার কথা নয়, তলিয়ে যাবার কথা। গোবর্ধনকেও রাস্তায় তলাতে হয়েছে!

রাস্তার মাঝখানে এমন করে গায়ে পড়া কি ভালো? ধূলো ঝেড়ে তীক্ষ্ণকণ্ঠে কথাটা সে দাদাকে সমঝাতে যাচ্ছে, হেনকালে দেখলে, দাদা ততোধিক রুষ্ট হয়ে আরেক জনের ওপর রীতিমতো চড়াও হয়েছেন।

এ সব কী হচ্ছে মশাই? হর্ষবর্ধন একেবারে সপ্তমে।

কিছুই করেনি লোকটা, কেবল আম খাচ্ছিলো। আম খাচ্ছিলো আর তার খোসাগুলো ছাড়িয়ে ছাড়িয়ে এধারে ওধারে ছুঁড়ছিলো। ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত, তারই একটায় পা পড়ে পতনোন্মুখ হর্ষবর্ধন, গোবর্ধনের আনুকূল্যে বা দৈবের কৃপায় এইমাত্র নিজেকে সামলেছেন। পড়তে পড়তে অধঃপতনের হাত থেকে বেঁচে গেছেন কোনো গতিকে।

আম খাচ্ছি। বললে লোকটা। নিশ্চিন্ত মুখে বললে। এবং তেমনি নিরুদ্বেগে আঁটি চুষতে লাগলো।

বাস্তবিক, লোকটার কী দোষ! সে তো খোস মেজাজে আম খাচ্ছে, দোষ কিছু হয়ে থাকে তো খোসার: গোবর্ধনের মনে হলো। আর দোষের কথাই যদি বলো, খোসাই বা কি এমন অপরাধী? তার দাদাও কিছু কম যান না - সূক্ষ্মভাবে বিচার করলে, একমাত্র বলতে হয় গোবর্ধন ন্যায়পরায়ণতার পক্ষপাতী। আর বলতে কি, তখনো গায়ের জ্বালা যায় না। তখনো সে দাদার ব্যথায় কাতর।

আম খাচ্ছেন তা তো দেখতেই পাচ্ছি। হর্ষবর্ধন রুখে উঠেছেন, কিন্তু আপনি খাবেন আম, আমরা খাবো আছাড়- এ কিরকম?

গোবর্ধন বললো : বাঃ বাঃ!

উক্ত ব্যক্তির আম্র ভোজন বা দাদার বাক যোজন, কাকে সে বাহবা দিলে বোঝা গেল না।

আমি তো আপনাদের আছাড় খেতে বলিনি। আপনারা খাচ্ছেন কেন, আমি তো কেবল আম খাচ্ছি। বললে সেই লোকটা।

আছাড় খেতে বলিনি ···আম খাচ্ছেন তো মাথা কিনেছেন আর কি! বললেন হর্ষবর্ধন : আম যেন কেউ আর খায় না।

আম খাচ্ছেন খান কিন্তু আমাদের মাথা খাচ্ছেন কেন? আপনার আম খাবার ফলে আমার দাদা যদি কারোর ঘাড়ে গিয়ে পড়ে সে আর আস্ত থাকবে? আমার দাদাকে দেখেছেন? গোবর্ধন তার দেদীপ্যমান দাদার দিকে আম্রসেবীর দৃষ্টি আকর্ষণ করলে। তার ঘাড় মাথা থেঁতলে যাবে না?

অমন বৃহদাকার হর্ষবর্ধনের দৃষ্টান্তে ভদ্রলোক বিচলিত হলো না, আরেকটা আমের খোসা ছাড়াতে শুরু করলে। আর ছাড়াতে ছাড়াতে বললে: কি করবো বলুন, আমরা তো খোসা সমেত খাই না। আপনারা খান কিনা জানা নেই, তবে গরুতে খায়, আমি জানি।

তা হলে গরু আর আপনি একসঙ্গে খেতে বসলেই ভালো হয় না কি? বললেন হর্ষবর্ধন। তাই বসবেন, দুই ভাইয়ে এবার থেকে।

আপনি খাবেন আম আর আমরা খাবো আমের আছাড় এটা কি ভালো? দেখতে একটু দৃষ্টিকটু হয় না কি? গোবর্ধন উৎসাহিত হয়ে উঠেছে তৎক্ষণে : আমের আচার হলেও বা কথা ছিলো?

আম্র-নিষ্ঠকে পরিত্যাগ করে কয়েক পা এগোতে না এগোতেই আবার এক অনিষ্ট! পুনশ্চ এক ফ্যাচাং—আরেক বিচ্ছিরি ব্যাপার।

ফুটপাথের একটা আলগা পাথরের তলায় জল জমানো ছিলো, হর্ষবর্ধনের পায়ের চাপে একধার থেকে তীরবেগে বেরিয়ে এসে গোবর্ধনকে লাঞ্ছিত করেছে। তার জামা-কাপড় একশা!

আরে আরে! পায়ের তলা থেকে পিচকিরি মারে কে রে! আবার কি দোলের রংবাহারের দিন এলো নাকি! হর্ষবর্ধন যেমন বিস্মিত তেমনি পুলকিত।

এই ভুঁইফোঁড় কাদা কোত্থেকে এলো, দাদা? গোবর্ধন কিন্তু ততো খুশী নয়: ইস্! কাপড়-জামার কোথাও ফাঁক রাখে নি!

কাদা কিরে, হাঁদা? খাসা মানিয়েছে তোকে! হর্ষবর্ধন উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছেন।- তোর চেহারায় খোলতাই হয়েছে খুব!

বলতে বলতে যেই না তিনি পা তুলতে গেছেন, তাঁর পায়ের চাপ থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে পাথরটার অন্য ধার থেকে আরেক দফা বেরিয়ে এসে তাঁর দফারফা করে দেয়; তাঁকেও বেশ মানানসই করে তোলে।

বাঃ বাঃ, তোফা! জোড় মিলেছে বটে! গোবর্ধন দেখে আর চোখ ফেরাতে পারে না। —একেই বলে সর্বজীবে সমদৃষ্টি! এতক্ষণে সে আরাম পায়। ভগবান আছেন বৈ কি! আলবৎ!

কাপড়ের চেহারা বদলানোর সাথে সাথে হর্ষবর্ধনের মুখের চেহারাও বদলেছে, তিনি বললেন ছ্যাঃ! এতবড়ো ফুটপাথ, কিন্তু এর কোথাও কি ছাই পা ফেলবার যো আছে? রাস্তায় তো গাড়ী মোটর গিসগিস—নেমেছো কি খরচ! কিন্তু ফুটপাথেই নিস্তার কই? এমন বড়ো বড়ো রাস্তা, কিন্তু পথ কোথায়?

আমি তো রাস্তার কোনো দোষ দেখি না! এক যাত্রায় পৃথক ফল হলে কি ভালো হতো নাকি? একজন মোটরে চেপে যাবে আর একজন মোটর চাপা পড়বে এটা কি রকম? হনুমানের ভাগ্যে যা, জাম্ববানের ভাগ্যেও যদি তাই হয় তাহলেই আমি খুশি।

বলছে সমদর্শক গোবর্ধন।

তা তো খুশী হলি, হবি না কেন? এখন একটা ডাইং ক্লিনিং দেখ দেখি, এগুলো কাচাবার ব্যবস্থা করা যাক। দুরদৃষ্টের পরেই দাদার দূরদৃষ্টি খুলতে থাকে।

কিন্তু খুব দৃষ্টিনিক্ষেপ করতে হলো না। ডাইং ক্লিনিং অদূরেই ছিলো। নাকের ওপরেই একেবারে। এবং বলতে কি, ডাইং ক্লিনিং ওলারাই, তাঁর মুখের কথা না খসতেই তাঁকে অভ্যর্থনা করলো:

'এই যে—এই যে, আপনার সামনেই আমরা আছি! চলে আসুন, কোনো দ্বিধা না করে চলে আসুন!

অদ্ভুত যোগাযোগ তো! যেখানে বাঘ সেখানেই সন্ধ্যে! যেখানে দাঙ্গা সেখানেই দারোগা! এমন তো দেখা যায় না। হর্ষবর্ধন বিস্ময়ে বিষম খান।

যা বলেছেন মশাই! অদ্ভুত যোগাযোগ। ওই পাথরের ওপরেই আমাদের এই ডাইং ক্লিনিং নির্ভর করছে, সত্যি বলতে হলে, কতো জায়গায় যে দোকান খুলেছিলাম, কিছু হয়নি। কবার যে খদ্দেরের কাপড়-চোপড় সব মেরে দিয়ে পাত্তাড়ি গোটাতে হলো, তবু মশাই এই চওড়া কপাল খুললো না। লোকে বলতো, পাথর চাপা কপাল! সে যে ওই ফুটপাথের পাথর, তা কে জানতো। অবশেষে, এই পাড়ায় এসে এই পাথর পেলাম, আর প্রাণও পেয়েছি। এখন দিনের মধ্যে কাজ কেবল ওই পাথরটার তলায় ঘণ্টায় ঘণ্টায় জল ঢালা। জল ঢেলে কাদা জমিয়ে রাখা। ব্যস্! এও একরকমের পাথর পূজো, কি বলেন? এখানকার ইতর-ভদ্রেরও গুণ গাইতে হয় অবশ্যি! সকলেরই বেশ উঁচু নজর! নীচের দিকে দৃষ্টি নেই কারো, আপনাদেরও দয়া আছে, সে কথাও বলতে হয় বই কি!

বক্তৃতা শুনে গোবর্ধন তো তাজ্জব আর হর্ষবর্ধন একেবারে পাথর। আরেকখানা পাথর বলতে হয় বৈকি!

ব্যবসা বুদ্ধি কাকে বলে, বোঝ!—ভালো করে বোঝ গোবরা!

পাথরটাকে পেরিয়ে আর একটু এগোতেই, এবারে এলো সেই ষাঁড়। এলো ঠিক বলা যায় না, সমস্ত ফুটপাথ জুড়ে তেমনি শুয়ে থাকলো—হর্ষবর্ধনরাই তার কাছাকাছি এলেন।

ফুটপাথ ত্যাগ করে পথে নামাও দায়। ট্রাম, বাস, মিলিটারী ভ্যান ভ্যাঁ-ভ্যাঁ করে—কিংবা না করেই ছুটছে আর এদিকে ফুটপাথে ষাঁড় বাবাজীবন এক ফুট পথও ফাঁক রাখেন নি। হর্ষবর্ধন সকাতরে বললেন, পথ ছাড়ো বাপু! গোবর্ধন সংস্কৃত করে জানালো, পন্থং দেহি। কিন্তু কাকস্য পরিবেদনা। সেই বিরাট দেহের নড়াচড়ার কোনো লক্ষণ দেখা গেল না।

অগত্যা গোবর্ধনচন্দ্র, 'ডিঙিয়েই যাওয়া যাক'—বলে যেই না ডিঙি মেরে সেই ষাঁড়ের ওপর দিয়ে দাদাকে পথ দেখাতে গেছে, কেন, তার কি খটকা লাগলো বলা ভার, ষাঁড়ও অমনি উঠে পড়েছে এক ঝটকায়। নিজের ওপরে অপর কারও লম্ফঝম্ফ তার তেমন ভালো ঠেকলো না বলেই বোধহয়।

এদিকে, সমুদ্র লঙ্ঘনের মুখে আটকে গিয়ে আঠার মতো ষাঁড়ের পিঠে লেপটে থাকলো গোবর্ধন। ষাঁড়টা লেজের ঝাপটা মারলে, কিন্তু মাছি নয় তো যে, উড়ে যাবে, এবং মাছি, এমন কি একটা দাঁড়কাকের চেয়েও বেশী ভারী বলে তার বোধ হতে লাগলো। এমন দুর্যোগে হৃষ্টপুষ্ট হর্ষবর্ধনকে সে দেখতে পেলো চোখের সামনে। দেখবামাত্র তার ধারণা হলো, তার পিঠের ওপরে যে দুর্ভোগ চেপে বসেছে, সে ও ছাড়া আর কেউ নয়। গরুর আর কতো বুদ্ধি হবে? আর ষাঁড় তো গরুরই নামান্তর—বলতে কি।

অতএব, বোঝাকে গুঁতিয়ে পিঠ হালকা করার জন্য হেলেদুলে হর্ষবর্ধনের দিকে সে এগোতে লাগলো।

ষাঁড়ের পিঠ থেকে চেঁচিয়ে উঠলো গোবরা: বক দাদা, বক্।

'বকবো? বক্‌বো কিরে? বকে কি হবে? বকলে কি ও শুনবে? না, বুঝতে পারবে? বললেন হর্ষবর্ধন: গরুরা কি বাংলা জানে?

আহা, বক্‌তে কি বলেছি? সে-বকা নয়, সনাতন খুড়োর সেই বক!—সেই বকের কথাই বলছি।

গোবর্ধন খোলসা করে দিতেই হর্ষবর্ধনের তখন মনে পড়ে যায় ওঃ, সেই বক! বক দেখানোর বক? তাই বল্!

হর্ষবর্ধনের মন তখন বলছে, পালাও। ষাঁড়ের সামনে দাঁড়িয়ো না কিন্তু মন পালাও বললে কি হবে, পা নেবার তাঁর ইচ্ছেই নেই তখন।

পায়ের দিকেই না, তাঁর সমস্ত মন তখন হাতের দিকে, নিজের কনুইয়ের তাঁবে, ষাঁড়টাকে এক হাত দেখে নেবার মৎলব তাঁর।

ত্রিভাঙ্গম ঠামে দাঁড়িয়ে ষণ্ডেশ্বরকে তিনি বক দেখিয়েছেন।

তিনিও বক দেখিয়েছেন আর ষাঁড়ও গুঁতো দেখিয়েছে।

কর্ণের যেমন অক্ষয় কুণ্ডল কবচ নিয়ে জন্ম, হর্ষবর্ধনও তেমনি ভুঁড়ি নিয়ে জন্মেছিলেন বলেই গুজব। ভাগ্যিস ষাঁড়ের গুঁতো জন্মগত সেই পেল্লায় ভুঁড়ির ওপর পড়েছিলো তাই রক্ষে, তা নাহলে কী হতো বলা যায় না, হর্ষবর্ধন মারা পড়লেন না। শুধু চিৎপাত হয়ে পড়লেন। আর সেই সংঘর্ষের প্রবল আলোড়নে গোবর্ধন ষাঁড়ের পীঠস্থান থেকে ফুটপাথে খসে পড়লো।

বক দর্শনের বিপরীত চালের কথা সনাতন খুড়োর কাছে যখন তোলা হলো, তিনি বললেন: সামনে কেন, ষাঁড়ের পিছনে বক দেখাবে তো!

লেজের দিকে দেখালে কি দেখতে পাবে ষাড়? পেছনে কি তার চোখ আছে? হর্ষবর্ধন অবাক হয়েছেন।—ষাড়েদের তো পশ্চাদদৃষ্টি নেই।

তেমনি লেজের দিকে শিংও তো নেই! সনাতনের নাতি শ্রীমান আধুনিক, দাদামশায়ের হয়ে জবাব দিয়েছে:

'সেটাও একটা প্রিভিলেজ নিশ্চয়ই।'

কোনো এক বাজে লেখকের গল্পের বই পড়ায় পোক্ত হয়েছে—তার জবাব থেকে তা টের পেতে মোটেই দেরী হয় না।

ভয়ঙ্কর ভারী একটা যুদ্ধ !

[বিলিতি 'ওয়ার-জার্নাল' থেকে ছাঁকা নকল, তাছাড়া যুদ্ধের গল্প পাবো কোথায়, যুদ্ধ কি আর স্বচক্ষে দেখেছি ?]

'বুবুম্ বুবুম্ বুম্—বুম্—বাম্—বোম্ !'

ঘন ঘন গর্জন হতে থাকে। ঘন ঘোর গর্জন !

আওয়াজের সঙ্গে-সঙ্গেই বোমারু বিমানদের কুচকাওয়াজে সারা আকাশ ভরে যায়।

যেমনি দেখা, যেই মাত্র শোনা, গোবর্ধন অমনি চিৎপটাং হয়েছে এবং দাদাকেও ভূমিশয্যায় আমন্ত্রণ করেছে। 'চটপট শুয়ে পড়ো দাদা ! দেখছো কি ? শুয়ে না পড়লে বুমিয়ে দেবে, বুঝছো না ?'

'বুম্—বাম্—বাম্—বোম্—বি-উম্ !'

বলতে না বলতে আকাশবাণীর মধ্যে গোবর্ধনের নিমন্ত্রণ পত্রের প্রতিধ্বনি শোনা গেছে।

হর্ষবর্ধন কিন্তু অচল অবিচল—বড়োবড়ো বিপদের সম্মুখে চিরদিনই তাঁর গোঁফের মতোই চাঞ্চল্যহীন। গোবর্ধনের কথাটা গ্রাহ্যই করেন নি।

শুয়ে থাকবার জন্যেই যুদ্ধে আসা কিনা ? যুদ্ধে আসা চাট্টিখানি নয় ! অমন কতো বুম্-বুম্ হবে, শুয়ে থাকলেই চলবে ? প্রাণ দিতেই এসেছি, প্রাণ ফিরিয়ে নিয়ে যাবো বলে আসিনি। তোর মতো, শুয়ে শুয়ে ল্যাজ নাড়ার নাম যুদ্ধ করা নয়।

'বুবুম্—বাবুম্—বাবুম্—বুবুম্—বুবুম্—বুমা—বুম্—বুং !'

তর্জন-গর্জনের তোড়জোড় বেড়েই চলে আরো।

'শুনলে না তো ? শুনলে না তো ? আমাকেই ভুগতে হবে, বেশ বুঝছি।' গোবর্ধন আক্ষেপ করতে থাকে।

খানিকক্ষণ ধরে গর্জন আর বর্ষণের পরে বোমারু বিদায় নেয়। কিন্তু অমনি দেখতে না দেখতে কোত্থেকে আবার এক ঝাঁক গোলাগুলি এসে হাজির! কোথায় যেন ওৎ পেতে ছিলো ওরা।

দাঁড়িয়ে উঠতে না উঠতেই গোবর্ধনকে ফের চাপিয়ে যেতে হয়।

'মাটি করলে! মাটালে দাদাটাই মাটালে! গোবর্ধন শুয়ে শুয়ে ফোঁস্ ফোঁস্ করে: 'মাঠময় করলে একেবারে!'

'কেন বক্-বক্ করছিস বল্ তো?' হর্ষবর্ধন ধমকে উঠলেন।

'আর রক্ষে নেই দাদা! বেশীক্ষণ বকতে হবে না। যা গোলা-গুলির তোড়! তোমার গালাগালির জোরকেও হার মানিয়ে দেয়!... অ-রিভয়ার, দাদা, অ-রিভয়ার!'

'কি? কি বলছিস! এ্যাঁ?'

'বিদায় নিচ্ছি দাদা, ফরাসী ভাষায় বিদায় নিচ্ছি তোমার কাছে।' কাতরস্বরে গোবরা জানায়: 'অ-রিভয়ার!'

মৃত্যুর মুখোমুখি শুয়েও বিদ্যা জাহিরের সুযোগ সে ছাড়ে না।

'তার মানে?' হর্ষবর্ধন গর্জন করে ওঠেন।

'তার মানে হচ্ছে গুড বাই। ইংরিজি গুড বাই - ফরাসী ভাষায় গিয়ে হয় অ-রিভয়ার।'

গোলাগুলির খচ্খচানিতেও যতটা না মেজাজ খিঁচড়ে ছিলো, গোবর্ধনের পাণ্ডিত্যের খোঁচায় তার চেয়ে ঢের বেশী বিগড়ে যায়। খানিকক্ষণ গুম্ হয়ে থেকে, তিনি বলেন, 'কার্বলিক অ্যাসিড্।'

জগতের বিভিন্ন ভাষাজ্ঞানে, তিনিই বা কারুর চেয়ে কম কিসে? তিনিও বলেন: 'বেশ, তবে তাই হোক—কার্বলিক অ্যাসিড্।'

'তার মানে?' এবার গোবরার অবাক হবার পালা।

'তার মানেও গুড বাই —তবে যে কোনো ভাষাতেই।'

হর্ষবর্ধন, যদিও একবার যুদ্ধে গেছলেন, কিন্তু সেখান থেকে ফিরে এসে তাঁর বিরক্তি ধরে গেছলো। তিনি স্থির করেছিলেন যে,

প্রাণান্তেও আর তিনি ওধারে কক্ষনো পা বাড়াবেন না। যুদ্ধক্ষেত্রটা ভারী বিচ্ছিরি জায়গা—একেবারেই যাবার মতো জায়গা না। তিনি ভেবেছিলেন, এর পর থেকে দুধের সাধ ঘোলেই মেটাবেন, বাদ-বাকী জীবনটা (এবং যুদ্ধে যখন আর যাচ্ছেন না, সে সময়টাও নিতান্ত সংক্ষিপ্ত হবার কথা নয়) যুদ্ধের গল্প পড়েই কাটিয়ে দেবেন।

কিন্তু, এর-ওর-তার লেখা যুদ্ধের গল্প পড়ে, তিনি আরো বেশী ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন! একটা গল্পে তিনি দেখলেন, একজন কম্যাণ্ডার (ইন্-চীফ্, কি, ইন্ মিসচীফ্ বলা শক্ত) ভেউ ভেউ করে কাঁদছে! দেখে তাঁর হাসি পেলো, একটুও তাঁর সহানুভূতি জাগলো না—না কম্যাণ্ডার না লেখক কারু ওপরেই। আর একটায় দেখলেন, একজন সৈনিক, গোলাগুলির ধাক্কা থেকে আত্মরক্ষার অভিপ্রায়ে, আর কোনো উপায় না পেয়ে অবশেষে একটা পিপের মধ্যে গিয়ে সেঁধিয়েছে—কাছাকাছির মধ্যে সেইটাই খুব নিরাপদ ভেবেছিলো হয়তো—তারপর দিন-সাতেক না পিপে-সাং থেকে, খেতে না পেয়ে প্রাণের দায়ে বেচারী চিঁচিঁ ডাক ছেড়েছে—এবং এইখানেই গল্প খতম্! এই কি পরে সেই কম্যাণ্ডার হয়েছিলো নাকি? কে জানে! এ দেখে তাঁর কান্না পেলো, এই ভেবে তিনি কেঁদে ফেললেন, এই সৈনিকই যদি সেই কম্যাণ্ডার না হয়ে থাকে—এখনো না হয়ে থাকে—তাহলে এককালে বা একজন হবে ভাবতেও ভয় করে। অবশ্যি, কে কি হবে বলা কঠিন। যুদ্ধের গল্পের লেখক হলে হয়তো বলে দেওয়া যেত যে, গাঁজার কল্‌কে ফিরি করে ফিরবে কিন্তু যোদ্ধার বেলা কিছুই বলা যায় না—কম্যাণ্ডার হলে, চাই কি, কান্নাকাটি করেই কেবল ঠাণ্ডা হবে না, হয়তো যুদ্ধের মহড়া দিতে দিতেই, বীরত্বের তাল ঠোকার সাথে সাথেই, বাবুম্ বুবুমের তালে, জমকালো নাচেরও একটা প্যাঁচ দেখিয়ে দিতে হবে। এবং যুদ্ধক্ষেত্রে সে কী ভয়াবহ বিচ্ছিরি দৃশ্য হবে—ভাবো দিকি!

যাই হোক, গোবর্ধনকে ডেকে তক্ষুনি তক্ষুনি তিনি জানিয়ে দিয়েছেন : বুঝলি রে গোবরা, এইসব যুদ্ধ-মার্কা গল্প কারা লেখে, জানিস ? যতো সব বুদ্ধু-মার্কা লোক।'

'আবার তার চেয়েও যারা বোকা, তারাই সেইসব গল্প পড়ে।' দাদার দিকেই কটাক্ষ করে গোবর্ধনের কথাটা বলা। 'কী বলো দাদা ?'

হর্ষবর্ধন কথাটা গায়ে মাখেন না। গায়ে লাগান না কথাটা। মারটা খেতে হলে চারিয়ে খাওয়াই ভালো। তাহলে আর ততো গায়ে লাগে না। এমন কি, তাড়িয়েও খাওয়া যায়।

তিনি বল্লেন : 'হ্যাঁ, আবার তার চেয়েও যারা বোকা, তারাই কিনা যুদ্ধে যায়। যেমন—যেমন আমরা গেছলাম।'

অর্থাৎ কথাটা তিনি ভালো করেই গায়ে মাখেন। গোবরাকে গোবরারই প্যাঁচে ফেলে ওর কথা, আর ওর সঙ্গে গায়ে গায়ে মাখামাখি করে, কোলাকুলি করেই, বলতে কি, একই চোরাবালির গর্তে দু'জনে জড়াজড়ি করে ডুবে যান !

সেই গল্পটা পড়েছিস নাকি ? হর্ষবর্ধন গোবরাকে ডেকে শুধোন : 'ভারী মজার গল্প।'

'কোন গল্পের কথা বলছো ?'

'সেই কম্যাণ্ডার-কাঁদানো গল্পটা! সেই যে, এদিকে একটা টাইম-বোম ফাটছে, আর ওদিকে একটা চীনে মেয়ে তিড়িং করে নাচ লাগিয়েছে আর তাই না দেখে এক জাপানী কম্যাণ্ডার হাউ মাউ করে কাঁদতে শুরু করে দিয়েছে। কাঁদছে আর বক্তৃতা দিচ্ছে।'

'না তো !'

'আহা, সেই যে-রে---!' হর্ষবর্ধন এবার ধমক দেন।

'উঁহু !' তবুও গোবর্ধনের মনে পড়ে না।

'আহা !—' হর্ষবর্ধন হঠাৎ গদগদ হয়ে পড়েন : 'আহা, সে রকম যদি হয় তাহলে আমি আবার আরেকবার যুদ্ধে যাই।'

'চীনে মেয়ের নাচ দেখবার জন্তে?' গোবর্ধন অবাক হয়ে যায়: 'প্রাণ হাতে করে নাচ দেখতে চাও, তোমার সখ তো কম নয়!'

'সেই তো মজা রে! নাচ দেখতে দেখতে বোমার ঠেলায় সটান আকাশে উঠে গেলাম। নর্তকী আমি, সবসমেত—মন্দ কি? সোজা-সুজি স্বর্গে রওনা—সেই তো আরাম! আঃ!'

'আরাম না কচু!' গোবরার ধারণা অন্যরকম।

'মেয়েদের নাচ দেখিস নি তো? তুই কি জানবি?' হর্ষবধন বলেন: 'দেখলে আর বাঁচতে ইচ্ছে করে না।'

'গান শুনেছি।' গোবরা বলে: 'গান শুনলে আমার পালিয়ে যেতে ইচ্ছে করে।'

'নাচ তো দেখিস নি! সে নাচ দেখলে পৃথিবী থেকেই পিট্টান দিতে চাইতিস।'

'ভারী ভয়ঙ্কর নাচ তো!' গোবর্ধন চোখ বড়ো বড়ো করে।

'হুঁঃ! ভয়ঙ্কর বলে ভয়ঙ্কর! সেই জাপানী কম্যাণ্ডার তো নাচ দেখেই আধমরা হয়ে গেছলো, বাকী যেটুকু ছিল টাইম-বোমেই সাবড়ে দিলো ব্যাচারার।'

'কোন্ কম্যাণ্ডার?' গোবরা ফের জিগ্যেস করে।

'সেই কাঁদুনে-কম্যাণ্ডার! কে আবার! কতবার করে বলবো? নাচ দেখছে আর বলছে, আমাকে মেরো না, দোহাই তোমার—তোমার পায়ে পড়ি, মেরো না আমায়—'

'সেই মেয়েটা ওকে খুব মারছিলো বুঝি?' গোবর্ধন বাধা দেয়: 'নাচছিলো তো বললে?'

'টাইম বোম হাতে নিয়ে নাচছিলো না? বললুম কি তবে? একটা ফাটন্ত বোমা! কি বললুম তবে?'

'ও—!' এবার গোবরা বুঝতে পারে।

'তোর কি আক্কেল গোবরা নাচের ভয়ে একজন কম্যাণ্ডার কেঁদে

ফেলবে—তুই—বলিস কি ? প্রাণের ভয়েতে ! বুঝতে তোর এত দেরী লাগে।' হর্ষবর্ধন ছ্যা-ছ্যা করেন।

'বুঝতে পেরেছি।' গোবর্ধন বলে : 'বাবা, তোমার সামনে আমি নিজেই কেঁদে ফেলবো, কম্যাণ্ডার আর বেশী কি।'

'তবেই বোঝ! একটা জাপানী কম্যাণ্ডার আর বেশী—কি!' হর্ষবর্ধন বলেন : 'তোমার সঙ্গে কারুর উপমা হয় ?'

'কি কম্যাণ্ডার বললে ? জাপানী কম্যাণ্ডার ? আমার বিশ্বাস হয় না।' গোবর্ধন ঘাড় নাড়ে। 'একদম না।'

'কেন, অবিশ্বাসের কি হলো ?'

'জাপানীরা প্রাণের ভয়ে কাঁদবে, আমার বিশ্বাস হয় না।'

'ব্যস্। আমি নিজের চোখে দেখেছি!'

'তুমি নিজে দেখেছো—কাঁদতে ?'

'কম্যাণ্ডারকে কি দেখেছি আর ? সে তো কাঁদতে কাঁদতেই উড়ে গেল ! সেখানে কি আমি ছিলুম ? দেখতে পেলুম কখন ? তবে বইতে ছাপার অক্ষরে লেখা ছিলো, তা স্বচক্ষে দেখেছি।'

'উঁহু, জাপানীরা কাঁদবে না। ওদের প্রাণের ভয় বলে কিছু নেই। ওদের সামান্য একজন সৈনিকই কাঁদবে না তো, কম্যাণ্ডার!' গোবর্ধন তথাপি ঘাড় নাড়ে।

'ব্যস! স্পষ্ট ভেউ ভেউ করে কাঁদছে। কাঁদছে আর বলছে, মেরো না, আমায় প্রাণে মেরো না, বাড়ীতে আমার বাবা আছে, মা আছে, পিসে, আছে পিসি আছে, আমার মা কাঁদবে, মামা কাঁদবে, মাসী কাঁদবে, মেনি কাঁদবে—এই সব একবারে স্পষ্ট লিখে দিয়েছে।'

'মেনি ? মেনি কে ?' গোবর্ধনের কৌতূহল।

'মেনি—মেনি বেড়াল—আবার কে ?' হর্ষবর্ধন গোবর গণেশ গোবর্ধনের অজ্ঞতা দেখে হতাশ হন : 'প্রত্যেক বাড়ীতেই ওরা থাকে—মেনিরা।' তিনি বিরক্তি চাপতে পারেন না।

'মেনি কাঁদবে কেন ?' গোবর্ধন আগে বেশী অবাক হয়।

'এত কান্নাকাটিতে সে কখনো চুপ করে থাকতে পারে? সে তো কাঁদবেই।' হর্ষবর্ধন বিজ্ঞের মতো বলেন 'আর সবাই তখন কাঁদছে– তার ম্যাও ধরে কে ?'

'কিন্তু জাপানী কম্যাণ্ডার কখনো প্রাণের ভয়ে কাঁদবে না। মেনি কাঁদলেও না।'

গোবর্ধন তার আগের গোঁয়ে ফিরে আসে। কতো প্রাণ তুচ্ছ করে—কতো বীরত্বের পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে তবে তারা কম্যাণ্ডার হয়। কম্যাণ্ডার কখনো প্রাণের ভয়ে কাঁদে ?'

দুঃখ কাতর ক্রন্দন নিপুণ কম্যাণ্ডারের অস্তিত্বে গোবর্ধনের ঘোরতর অবিশ্বাস। নাস্তিক্যবাদী গোবর্ধন।

'তাইতো—তাইতো—' হর্ষবর্ধন আমতা আমতা করেন 'চারধারে কত বোমা ফেটেছে, আমিই যখন কাঁদিনি, আমারই যখন যুদ্ধে গিয়ে কান্না পায়নি, তখন একজন—একজন কম্যাণ্ডার—' এবার হর্ষবর্ধনের অন্তরেও সন্দেহ সঞ্চারিত হয়।

'একজন কম্যাণ্ডার তো নেহাৎ কম নয়।' গোবর্ধন জোর দেয়।

'বাস্তবিক যা বলেছিস।' এই সব যুদ্ধের গল্পের কোনো মাথা মুণ্ড নেই।' বলে দেন হর্ষবর্ধন।

'যারা লেখে তাদেরও নেই দাদা।' গোবরা জানায়।

'তাদের ? তাদের আবার মাথা ? মাথা থাকলে মানুষ কখনো যুদ্ধের গল্প লেখে ? তাদের খালি ধড়। যতই ধুরন্ধর হোক—খালি ধড়! যা বলেছিস!

'যুদ্ধের গল্প লিখতে আবার মাথা লাগে নাকি দাদা? গল্পের পেটে বোমা মারো অমনি একটা যুদ্ধের গল্প হয়ে গেল। এধারে ওধারে গোটা কতক বাবুম বুবুম ছেড়ে দাও—ব্যস্! গল্পও মারা পড়লো, পাঠকরাও আধমরা! সবাই খাবি খাচ্ছে।'

'তুই ঠিক বলেছিস! খালি ধড়! যুদ্ধের গল্প যারা লেখে তাদের মাথা নেই সত্যিই!'—হর্ষবর্ধন যেন বিস্মৃতির জঞ্জাল ঘেঁটে হারানো রতন খুঁজে পান হঠাৎ: 'ধড়ই বটে! ধড়ই তো! আমার মনে পড়ছে তখন!'

'কারু কারু আবার ধড়ের ওপরে লাল থাকে। তুমি দেখে নিয়ো।'

'থাকবেই তো! লাল না থেকে পারে না। মাথাটা সেখান থেকেই কাটা গেছে কিনা! তাই রক্তাক্ত হয়ে রয়েছে। সেই কারণেই লালায়িত ধড়। তা আর বুঝছিস নে?'

'এক একটি আস্ত কবন্ধ লাল ধড়। একেবারে তৈরী। খোসা ছাড়াও আর শিক্‌কাবাব্ বানাও। আর টপাটপ্ মুখে পোরো।' কল্পনা করতেই গোবরা লালায়িত হয়ে পড়ে।

'ছিঃ গোবরা, শিককাবাবে ঘেন্না ধরিয়ে দিস্‌নে—' হর্ষবর্ধন ভাইয়ের আদিখেত্যায় বেজার হন: 'এমন করলে আর কোনোদিন আমি শিককাবাব্ মুখে তুলতে পারবো না! ওকথা বললে, ও রকম তুলনা দিলে, অমন ভালো জিনিসেও আমার অরুচি ধরে যাবে কিন্তু।' হর্ষবর্ধন মুখ গোমড়া করে থাকেন

'বাঃ, আমি খারাপটা কি বলেছি? আমি তো অখাদ্য বলি নি।' গোবর্ধন, গল্প লেখক ওরফে শিককাবাব্...উভয়ের তরফে ওকালতি চালাবার চেষ্টা করে। 'একেবারে অখাদ্য বলিনি তো!'

'কিন্তু যাই বল্, বেড়ে লিখেছিলো কিন্তু! আমায় মেরোনা, পরাণে মেরোনা—আহা! মাথা না থাক, মাথা ব্যথা খুব ছিলো! কম্যাণ্ডারটার ছিঁচ্‌কাঁদুনেপনায় এখনো আমার রোমাঞ্চ হচ্ছে। ভাবতেই শিউরে উঠছি বাবা!'

'আর সেই মেয়েটার তিড়িং বিড়িং?' গোবর্ধন কল্পনা-নেত্র উন্মীলিত করে তাকাতে চায়।

'আহা! সেতো আরও খাসা! আমি হলে কিন্তু ওর চেয়ে সেই জাপানী হতভাগাটার চেয়ে, আরো ঢের ভালো অ্যাক্‌টো করতে পারতুম! বলতুম, আমার এই গোঁফ চুমরেই বলতুম, আমায় মেরোনা …এখনই মেরোনা…এখনও আমার রূপ আছে…যৌবন আছে…'

'ছিঃ, দাদা, টুকলিফাই করোনা!' গোবর্ধন বাধা দেয়।

'টুকলিফাই? তার মানে?'

'তুমি গোবিন্দলাল কপ্‌চাচ্ছ না?'

'গোবিন্দলাল কপ্‌চাচ্ছি, তার মানে?'

'তুমি গোবিন্দলালের লেখা বঙ্কিমচন্দ্রের উইল বইটা থেকে আউড়ে যাচ্ছ নাকি? সেই যেখানে কৃষ্ণকান্ত পিস্তল হাতে নিয়ে সূর্যমুখী না কার কাছে ওই বক্তৃতা দিচ্ছে আর সঙ্গে সঙ্গে সেই ডুড়ুম্! বলতে বলতে গোবর্ধনের চুল খাড়া হয়ে ওঠে: 'গুড়ুম্ করে পিস্তলের আওয়াজ ছেড়ে দিয়েছে হ্যাঁ, সেটাও একটা যুদ্ধের গল্প বটে! তাতেও খুব ডুড়ুম্ দাড়াম্ ছিলো! তবে বেশ ভালো যুদ্ধের গল্প।'

'ভালো যুদ্ধের গল্প? তাই বইকি?' হর্ষবর্ধনের দাঁত কিড়মিড় করতে থাকে: 'আমার সঙ্গে চালাকি? আমার কাছে বিদ্যা ফলানো? আমি বুঝি আর জানিনে? গোবিন্দলালের লেখা বঙ্কিমচন্দ্রের উইল? তাই বুঝি বইটা? তাই বুঝি?'

'তবে কি? কৃষ্ণকান্তের লেখা গোবিন্দলালের উইল? না কি বিষবৃক্ষের লেখা রাজসিংহের মঠ? উঁহু. মঠও নয়—রাজসিংহও নয়—মেঘনাদবধও নয়. উইল তার মধ্যে রয়েছে, আমার বেশ মনে পড়ছে।'

'আমি আর কখনো যুদ্ধে যাচ্ছিনে! কখখনো না।' হর্ষবর্ধন নিজেই বোমার মতো ফাটেন—'তুই বেঁচে থাকতে নয়! তোর সঙ্গে আবার আমি যুদ্ধের দিকে পা বাড়াবো? তুই তাই ভেবেছিস! যুদ্ধ ক্ষেত্রে তোর মুখ আর আমি দেখছিনে! চাঁদে মেয়ে এসে যদি নাচ লাগায় তাহলেও না!'

কিন্তু তিনি—তিনিও ভাবতে পারেন নি যে, এহেন দৃঢ় প্রতিজ্ঞার পর, তিনিই আবার যুদ্ধের দিকে পা বাড়াবেন এবং গোবর্ধনকে সঙ্গে নিয়েই আবার তাঁকে দ্বিতীয়বার যুদ্ধ যাত্রা করতে হবে!

তবু সেই দুর্ঘটনাই ঘটে গেল একদিন। একটা সৈন্য-সংগ্রহের সভায় গিয়ে, কেবল মজা দেখতে গিয়েই, কি করে কক্ষচ্যুত হয়ে, তিনি একেবারে ওয়াজিরিস্থানের সীমান্তে গিয়ে উপনীত হলেন, মিলিটারী সাজ-পোষাকে কেতাদুরস্ত হয়েই হাজির হলেন গিয়ে, তার বিস্তৃত বর্ণনা এখানে অনাবশ্যক। এইটুকু বললেই যথেষ্ট হবে, কেবল হাজির হওয়াই না, হাজির হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই, কি কেরামতি দেখিয়ে কে জানে, সামান্য যুদ্ধজীবীর পদে পদে বিপদ থেকে অসামান্য কম্যাণ্ডারের অভ্রভেদী পদে তিনি সমুত্থিত হয়ে গেছেন!

কি করে হলেন তা কী করে বলবো! যুদ্ধক্ষেত্রে স্বভাবতঃই এ সব ঘটে থাকে, নিশ্চয়ই ঘটে, আখচারই ঘটছে; তা নইলে যুদ্ধের গল্পে কি এসব মিথ্যে লেখে নাকি? এই বেড়াল বনে গেলেই বন-বেড়াল হয়, তাই নগণ্য হর্ষবর্ধন. ওয়াজিরিস্থানে মজুৎ হওয়া মাত্রই জিরোতে না জিরোতেই যে এক নম্বরের হীরোতে পরিণত হবেন সে আর বিচিত্র কি? না হলেই বরং বিস্ময়কর হতো!

যুদ্ধক্ষেত্রে তো গেছেন, সশরীরে এবং স-গোবরাই গিয়ে পড়েছেন! তাঁর ভাই গোবর্ধন তাঁর লেফ্‌টেন্যাণ্ট, তাঁর বাঁদিকেই রয়েছে। রামের যেমন লক্ষ্মণ ছিলো। তাঁরা দুজনে সীমান্তের একটা ঘাঁটি পর্যবেক্ষণ করছেন, এমন সময়—

এমন সময়ে আর কি! একটু আগেই, এই গল্পের গোড়াতেই যা পড়েছো। যুদ্ধক্ষেত্রের যা রেওয়াজ, তোমাদের তো আর অজানা নেই, চারধার থেকেই ভারী জোর সোর-গোল পড়ে গেল: 'বাবুম্ বুবুম্!... বুম্ বুম্...ব্যবম্ ব্যবম্...ব্যোম্'।—

আবার কি? বোমারু বিমানদের হৈ চৈ পড়ে গেল হঠাৎ।

ভয়ঙ্কর ভারী একটা যুদ্ধ!

গোবর্ধনের ভারী খারাপ লাগছিলো, পরিস্থিতি এবং দাদা—দুজনকেই লক্ষ্য করে না বলে সে পারলো না : 'যুদ্ধের গল্প পড়ছিলে,—বেশ ছিলে, এখানে মরতে এলে কেন? এখন ঠ্যালা বোঝ!'

'দেশের জন্য প্রাণ দেবো, তাই দিতেই এসেছি। ঠ্যালা বোঝাবুঝি আবার কি?' হর্ষবর্ধন খাপ্পা হয়ে গেছেন।

'দেশের জন্যই দাও, আর বিদেশের জন্যই দাও, প্রাণ তোমায় দিতেই হবে।' গোবর্ধন ভালো করে দাদাকে সমঝিয়ে দেয় : 'না দিয়ে পরিত্রাণ নেই। দেখছো তো কী রকম বাবুম্ বুবুম্। চারধারেই কি রকম! বাব্বা! ঠিক যে রকম তোমার—সেই সব বইয়ে টইয়ে পড়া গেছলো।'

দেখতে দেখতে পাঁই পাঁই করে আকাশ বাতাস ছেয়ে গেল। সব ধারে কেবল এরোপ্লেন আর এরোপ্লেন। বোমারু বিমান যতো না! আর ভেতর থেকে ছিট্‌কে-ছিট্‌কে, ওল্‌টাতে পাল্‌টাতে ডিগবাজি খেতে খেতে, হরদম্ আর ভরদম্, কেবল বেরিয়ে আসছে, আর কিছু না, বুবুম্ বুবুম্ বুম্! বুবুম্ বুম্! একটানা বুমৎকার। 'ওয়ার বুম' যাকে বলে!

হর্ষবর্ধন ঘাড় কাৎ করে একবার দেখেন : 'আমার যেন কেমন কেমন লাগছে রে! এগুলো—এগুলো শত্রুপক্ষের বিমান বটে তো? না আমাদের দলেরই—ভুল করে আমাদের ওপরেই গুল ঝাড়ছে।'

'আমাদের দলের হলে কখনো এতো বোমার ছড়াছড়ি করে? অন্তত আমাদের দিকে ছড়ায় কখনো? তারা তো অন্য চালও দিতে পারতো। পারতো না কি?'

'তা বটে! কিন্তু আমি ভেবেছিলাম কি, আসল রণক্ষেত্র তো এখান থেকে অনেক—অঢেল দূরে! এতো সবে মাত্র ওয়াজিরিস্থান—আমাদের নিজেদের নর্থ-ওয়েষ্টার্ণ ফ্রন্‌টিয়ার—এতো আর সেই আসল ওয়েষ্টার্ণ ফ্রন্ট্ নয় ভায়া।'

'নাই বা হলো! আর হলেই বা কি হয়? যুদ্ধ কি তোমার জিওগ্রাফি মানে? বলে, ইতিহাসকেই তোমার পাল্টে দিচ্ছে! যুদ্ধের সবই উল্টো রকম।' গোবর্ধন জানায়।

যাক, খানিকক্ষণ পাখা ঝটাপটি করে, যেমন ওদের দস্তুর, একটু মজা করে বুমাবুম বাধিয়ে, বোমারুরা তো কেটে পড়লো। হর্ষবর্ধন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। গোবর্ধন কপালের ঘাম মুছে ফেললো। মুছবার সুযোগ পেলো।

হর্ষবর্ধন তখন হাঁটু গেড়ে বসে ফিল্ড্ গ্লাস চোখে লাগিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রের তদারকে লাগলেন।

এই অঞ্চলের পার্বত্য জাতিরা খুব সুবিধের নয়। যেমন দুর্ধর্ষ, তেমনি দূরদর্শী। পুরু লতাগুল্মের আড়ালে দিব্যি ওরা লুকিয়ে থাকে আর এ-ধারে উপত্যকার ধারে কাছে এ পক্ষের লোকজন দেখতে পেলেই, আর কথা নেই, সুদূর থেকেই লক্ষ্যভেদ করে বসে আছে। ফাঁক পেলেই তাক করবে, আর তাক্ পেলেই ফাঁক করে ছেড়ে দেবে। এ বিষয়ে ওরা একেবারে অব্যর্থ।

এদের নিয়ে হর্ষবর্ধন বেশ একটু মুশকিলেই পড়েছিলেন।

কোথায় যে ওরা ঘুপটি মেরে চুপটি করে বসে রয়েছে, বোঝবার জো নেই। অথচ, মাঝখান থেকে দিব্যি দু-চার জন করে মাঝে মাঝে ওঁদের বাজে খরচ হয়ে যাচ্ছে।

তাঁর সৈন্যেরা ঝাঁপিয়ে পড়ে হাতাহাতি লড়াই করতে প্রস্তুত, সম্মুখ যুদ্ধে-মজবুৎ ওরা, কিন্তু লড়বে কাদের সঙ্গে? সামনে কাউকে পেলে তো! কোত্থেকে যে গুলি আসে আর কোনখান দিয়ে কার যে মাথার খুলি ছিটকে নিয়ে বেরিয়ে যায়, সেই এক সমস্যা।

তাই হর্ষবর্ধন, গোবর্ধনকে ল্যাজে বেঁধে, হন্তদন্ত হয়ে, নিজেই আজ তদন্ত করতে বেরিয়েছেন।

বুম্বাম্-ওয়ালাদের উপদ্রব উপে যাবার পর মাটির ওপর নীল-

ডাউন হয়ে, ফিল্ড্ গ্লাসটি তিনি চোখে লাগিয়েছেন। হঠাৎ কোত্থেকে আবার এক ঝটকা ছর্রা এসে হাজির। গুলির ছর্রা।

গোবর্ধন পাশেই দাঁড়িয়েছিলো, তৎক্ষণাৎ চিৎপাৎ হয়ে পড়েছে, 'দাদা, দাদা! শুয়ে পড়ো, গুলি আসছে—গুলি!'

হর্ষবর্ধন কথাটা কানেই তোলেন না।

আবার আর এক চোট গুলিবর্ষণ। বলতে না বলতেই হয়ে যায়।

'বলছি কি, শুনছো না? আফরিদিরা বন্দুক হাঁকড়াচ্ছে! হাঁ করে দেখছো কি?' গোবর্ধন তর্জন করে। হর্ষবর্ধন তথাপি নড়েন না। যেমন করছিলেন তেমনি একদৃষ্টে পর্যবেক্ষণ করে চলেন।

সাঁই! সাঁই!! ওঁদের চারধারেই বুলেটরা শন্ শন্ করে এসে শীষ দিতে দিতে চলে যায়। দম্দম্ বুলেট যতো। হর্ষবর্ধন কিন্তু গ্রাহ্যই করেন না।

'ডোবালে দেখছি।' গোবর্ধন শুয়ে শুয়ে প্যাচাল পাড়ে।

হর্ষবর্ধন একবার মাত্র চোখ তুলে, গোবর্ধনের দিকে চকিত এক কটাক্ষে বিরক্তিজনক একখানা দৃষ্টিবাণ হেনে আবার নিজের কাজে মন দিয়েছেন।

এবারে ঝমাঝম করে গুলিরা আসতে থাকে। শ্রাবণের ধারা বর্ষণের মতো এসে হানা দেয়।

'গেছিরে বাবা। গোল্লায় গেছি।' গোবর্ধন বলে—'আমি না গেলেও তুমি গেছো। কয়েক ইঞ্চির জন্য কেবল ওদের ফস্কে যাচ্ছে। তোমার খুলিটা লোকেট্ করতেই যা দেরী হচ্ছে একটু।'

হর্ষবর্ধন তথাপি নট্-নড়ন্-চড়ন্। তবুও কোন হুঁশ নেই ওঁর।

'ধুত্তোর!' গোবর্ধনের মেজাজ যায় চড়ে: 'কী ওই সব জাঁদরেলপনা হচ্ছে? আরেকটু হলেই সাবাড় হয়ে যাবে যে। দেখতে পাচ্ছো না, ওরা প্রায় তোমাকে বাগিয়ে এনেছে। গেলে বলে!'

'তবে তাই হোক।' হর্ষবর্ধন ফেরেন এবার।

বলতে না বলতে, কথাগুলো তাঁর মুখ থেকে খসেছে কি খসেনি, বুলেটের ধাক্কায় তাঁর মাথার টুপি উড়ে যায়। এবং এরপর গোবর্ধনকে আর কিছুই বলতে হয়না, আর কোনো সদুপদেশের প্রয়োজন হয় না; কারো কথার তোয়াক্কা না রেখে তড়াক করে হর্ষবর্ধন তৎক্ষনাৎ কাৎ হয়ে গেছেন।

'এতক্ষণ কি বলছিলাম তবে ?' গোবর্ধন বাহাদুরি নেয়: 'বলছিলাম না যে আর একটা গুলির ওয়াস্তা কেবল ?'

হর্ষবর্ধন বোকার মতো একটু হাসেন: 'ভ্রাতঃ গোবর্ধন! সত্যিই তুই আমাকে ভালোবাসিস! আমার জন্যে প্রাণ দেওয়া তোর

পক্ষে কিছু না আমি জানি, কিন্তু তার চেয়েও বড়ো কথা, তোর নিজের জন্যেই আমার প্রাণটা তুই বজায় রাখতে চাস।'

'চাই না ছাই!' গোবর্ধন গজ্ গজ্ করে: 'কেন, তুমি মলে কি আমি অনাথ হয়ে যাবো, তুমি ভাবো? আমার তিন কুলে কেউ আর থাকবে না?' গোবর্ধন গজরায়।

'না না, তা কেন? তা কি আমি বলেছি?' হর্ষবর্ধন বলেন: 'তবু যে তুই আমার ভালো-মন্দ দেখছিস, এই যুদ্ধক্ষেত্রে এসেও এটা ভুলে যাসনি, সেটা কি বড়ো কথা? তোর পক্ষে কি কম প্রশংসনীয়?'

'ভালো-মন্দ না কচু! স্থানে-অস্থানে একটা গুলি এসে লাগলে কী হতো তা খেয়াল আছে?'

'বড়ো জোর মারা যেতাম, এই তো? তা ওরকম গুলি লাগেই, যুদ্ধ করতে গেলে লেগেই যায়, না লেগেই পারে না। তার জন্যে ভাবি না, কিন্তু তুই যে এতোখানি আমার জন্যে ভেবেছিস, এতেই আমি মর্মান্তিক বাধিত হয়ে গেছি। আমার জন্যে তোর এতো দরদ! যাতে আমি মারা না যাই, তাই ভেবেই তুই এতো কাহিল হচ্ছিস!'

'মারা গেলে তো বাঁচতুম!' গোবর্ধন বাধা দিয়ে বলে: 'সেই কথাই আমি ভাবছিলুম কিনা! কিন্তু খুন না হয়ে যদি জখম হতে, তাই যদি হতে দৈবাৎ, তা হলেই হয়েছিলো আর কি! গিয়েছিলাম আমি! আমিই তো গিয়েছিলাম! তাহলে তো তোমার ওই পাক্কা তিন মণ কাঁধে করে সেই সাত মাইল দূরের হাসপাতালে আমাকেই বয়ে নিয়ে যেতে হতো। বাবা গো! আমাকে আর দেখতে হতো না। আমার হয়েছিলো তাহলে, সুখ আর ধরতো না আমার!'

হর্ষবর্ধন চুপ করে থাকেন। গোবরার বক্তব্যটা বিশদভাবে হৃদয়ঙ্গম করতেই সময় লাগে। নিজের দিকে দৃক্‌পাৎ করে, অবশেষে একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে ক্ষুণ্ণস্বরে তিনি বলেন: 'ওরকম বইতেই হয়। যুদ্ধ তবে বলেছে কেন? ভারী ভারী যুদ্ধের বোঝা কি কম?'

তাঁর মুখ থেকে কেবল এই কটি কথা বার হয়, আর্তনাদের সুরেই বেরিয়ে আসে।

'যুদ্ধ তো ভারী!' গোবর্ধন জবাব দেয়: 'তুমি নিজে কেমন ভারী সেটা তো দেখছো না। যা একখানা লাশ বানিয়ে তুলেছো নিজেকে। ওই চেহারার ওপরও, আরো চারবেলা রুটি মাংস গিলে গিলে যা তুমি হতে চলেছো দিনকে দিন। এই যুদ্ধ বেশী দিন চললে তোমাকে আর এখান থেকে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া যাবে কিনা সন্দেহ। তুমি নিজেই চলতে পারবে না! বলতে কি, তুমিই যুদ্ধটাকে আরো ভারী করে তুলেছো দাদা!' গোবর্ধনও একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে দেয়।

'তাহলে—তুই যখন হাল্‌কা থাকতেই চাস—আমার বোঝা বইতে যখন তুই এতোটাই নারাজ—তাহলে—তাহলে—' হর্ষবর্ধন একটু থামেন।

অন্তিম সুরে চূড়ান্ত ব্যঞ্জনা দিতেই তিনি থামেন; করুণ কণ্ঠে তাঁর শেষ বিদায়-বাণী উচ্চারিত হয়: 'বেশ তাই হোক তাহলে! তাহলে কার্বলিক্ অ্যাসিড—চিরদিনের জন্যেই কার্বলিক্ অ্যাসিড!'

ভাঁড়টা তাকের ওপর রেখে হর্ষবর্ধন ভাইয়ের দিকে তাকান—'এদিকে যেন নজর দিসনি, বুঝলি ?'

দিলও না গোবরা। তার নজর ছিলো এক বইয়ে তখন। দু-চোখ দিয়ে বইটাকে যেন সে গিলছিলো।

'সাড়া দিচ্ছিস না যে ? এই বড়ো ভাঁড়টায় বাগবাজারের রসগোল্লা রইলো—'

'বয়েই গেল আমার!' সাড়া মিললো গোবর্ধনের : 'তোমার ভাঁড়ে বাগবাজারই থাক্ আর মা ভবানীই থাকুন—আমার কী!'

'পেটে পুরিস নে যেন ভুল করে।' হর্ষবর্ধন বাতলান : 'আমার বিকেলের জলযোগ। আমি খাবার পর তুই অবিশ্যি একটু পেসাদ পাবি।'

'তোমার পেসাদ আমার মাথায় থাক। চাইনে খেতে।'

'তা বটে। তা বটে!' শুনে দাদা ভারী প্রীত হন—'পেসাদ তো মাথায় করেই রাখতে হয় রে। তা না হয় রাখলি, কিন্তু তাই বলে একটুও চাখবিনে ? তা কি হয় ? একটু আধটু চাখবি বৈ কি!'

'কী আমার মহাপ্রেসাদ!' গোবরা বইএর পাতার সঙ্গে নিজের ঠোঁট ওল্টায়।

'কী বই পড়া হচ্ছে শুনি ? অমন করে মন দিয়ে।'

'একখানা বই।'

'একখানা বই যে তাতো দেখতেই পাচ্ছি। একখানা কেন, দুখানাই তো দেখছি। বালিশের তলায় ওটা কী ? কী বই ওটা ? কার লেখা ? লেখক কে ? নাম কি বইয়ের ?'

'নিখর্চায় জলযোগ। লেখক হচ্ছে গে—'

'কী বললি ? নিখর্চায় জলযোগ ? ছাখো বাপু, ওই সব বাজে

বই পড়ে নিজের মাথাটি খেয়ে তার পরে যেন আমার জলযোগের ভাঁড়ে তোমার হাত বাড়িয়ো না। ওই সব নিখর্চার জলযোগ আমি বরদাস্ত করবো না, তা কিন্তু আমি বলে দিচ্ছি। আর যে-বইটা তোর হাতে আছে, সেটা ?'

'আরেকটা গল্পের বই। "কথা বলার বিপদ!" ওটা যার লেখা, এটাও তার। শিব্রাম্ চকর্‌বর্‌তির।'

'এই মরেছে! ওই সব বোনেশে লোকের বই তুই পড়ছিস ?'

'পড়ছিই তো। কেন, কী হয় পড়লে ?'

'আমার পিণ্ডি হয়। কথাবার্তা গুলিয়ে ফেলবি যে সব! কথায় আর মানেতে তালগোল পাকাবি। এক কথা বললে বুঝবি অন্য কথা, এক কথার অন্য মানে বের করবি। কথাদের মান-মর্যাদা কিছুই আর থাকবে না। কথায় কথায় কতো কথা টেনে আনবি, মাথা-মুণ্ডু কিছু যদি তার থাকে! কিছু যদি তার বোঝা যায়!'

'তোমাকে বলেছে!'

'দেখি বইটা।' হর্ষবর্ধন বইখানা হাতে নিয়ে নেড়ে-চেড়ে দেখেন—'কেন, এই তো বলেই দিয়েছে এইখেনে। "শিব্রাম্ চকর্‌বর্‌তির মতো কথা বলার বিপদ।" গোটা-গোটা অক্ষরে মোটা-মোটা লাইনে পরিষ্কার করে বলেই দিয়েছে লোকটা। নিজেই বলে দিয়েছে। নাঃ, বিপদ বাধালে সত্যি!'

'আমার বিপদ আমি বুঝবো। তুমি বই দাও তো! তোমার রসগোল্লা খাও না বাপু!'

'পড়বি তো পড়, পড়ে মরবি তো মরগে। টের পাবি শেষটায়। যখন নিজের কথার মানে নিজেই বুঝতে পারবি নে, বুঝবি তখন। আমার কী! আমি বলে খালাস। হ্যাঁ, ভালো কথা, আমাদের গৌহাটির কাঠগুদাম থেকে আজ একটা ট্রাঙ্ক-কল আসবে—কলটা এলেই আমায় বলিস। বুঝেছিস ?'

'আচ্ছা-আচ্ছা।' গোবরা আবার বই নিয়ে পড়ে। কিন্তু কথাটায় ওর টনক নড়ে। চকিতের মতোই মনে হয়, ট্রাঙ্ক-কল...সে আবার কী? কাঠের গুদাম থেকে আসবে বলছে। গাছের গুঁড়িকে তো ট্রাঙ্ক বলে জানি। আবার হাতীর শুঁড়কেও বলে থাকে। আবার বাক্সো-প্যাঁট্রাকেও বলা হয়। তাহলে এ কিসের ট্রাঙ্ক? ভাবতে-ভাবতে বইএর মধ্যে তার ভাবনার খেই হারায়।

হর্ষবর্ধন গায়ের কোট খুলে বিছানায় গিয়ে লম্বা হন। কম্বলটা টেনে নেন গায়ের ওপর। কিন্তু কম্বলে কি শানায়? শীতের কন্‌কনে হাওয়া খোলা দরজার পথে সেঁধিয়ে হাড় অব্দি কাঁপিয়ে দেয়।

'এই, দরজাটা ভেজা তো!' কাঁপতে-কাঁপতে হাঁক পাড়েন শ্রীহর্ষ।

বইয়ে মশগুল, সেই হর্ষধ্বনি কানে যায় না গোবরার।

'কানে যাচ্ছে না বুঝি কথাটা?' দাদাকে গলা চড়াতে হয়—'বলছি না দরজাটা ভেজাতে?'

বাধ্য হয়ে গোবরাকে বই ফেলে উঠতে হয় এবার। এক বালতি জল এনে ছিটিয়ে ছিটিয়ে দরজা ভেজাতে লেগে যায় সে।

'এই মরেছে! কী করছে ঢ্যাখো! রোগে ধরেছে এর মধ্যেই। বললুম কী, আর বুঝলো কী! আরে মুখ্যু, আমি কি তোকে জল দিয়ে দরজা ভেজাতে বললুম? দরজাটাকে লাগাতেই তো বলেছি।'

'তাই বলো! সেকথা বললেই হয়!' কোণের থেকে দাদার সেগুন কাঠের দামী লাঠিটা নিয়ে এসে এমন লাগান্ লাগায় সে, যে দরজা আর দাদা একসঙ্গে আর্তনাদ করে! লাঠিটা তিন তিনটে টুকরো হয়ে যায় দেখতে না দেখতে!

সেগুনের ধ্বংসলীলার পর গোবর্ধন চন্দনকাঠের লাঠিটার দিকে হাত বাড়াচ্ছে দেখে দাদা হাঁ-হাঁ করে ওঠেন—'থাক্ থাক্। আর

দরজা লাগিয়ে কাজ নেই। খুব হয়েছে। যা হবার তা হয়েছে। দরজা আর তুই কোনদিন লাগাতে পারবি না। দরজা ভেজানো, দরজা লাগানো—কাকে বলে, তা তুই আর বুঝতেই পারবি না। এ-জন্মে আর নয়। যাক, যা হবার হয়ে গেছে। যেটি আশঙ্কা করেছিলাম সেই সর্বনাশের কিছু আর বাকী নেই।' হর্ষবর্ধন দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়েন।

'কী বলছো তুমি, পষ্ট করে বলো না?' গোবরা জিগ্যেস করে— 'লাগাতে বলছো, না, ভেজাতে বলছো? একসঙ্গে দুটো কাজ হয় না।'

'যা বলছি সে আর তোর মাথায় ঢুকলে তো! বলবো এক, বুঝবি ঠিক তার উল্টোটি।' বলতে গিয়ে হঠাৎ তাঁর মনে হয়, আচ্ছা, যদি উল্টো করে বলা যায় তাহলে হয়তো এই উল্টো-বুঝলি-রামের মাথায় গিয়ে সোজা হয়ে সেটা ঢুকতে পারে।— 'বলছিলাম কি, দরজাটা আরো ভালো করে খুলে দে। দরাজ করে একেবারে।'

'খুলে দেবো দরজাটা? তাই বলছো? কিন্তু ইস্ক্রু-ড্রাইভার কই?' জবাব আসে গোবরার: 'তাহলে তো এখন আমায় মিস্তিরি ডাকতে হয়।'

এ-কথায় হর্ষবর্ধনকে যেন একেবারে বসিয়ে দেয়। শুয়েছিলেন, উঠে বসেন। গালে হাত দিয়ে বসে থাকেন। কী যে বলবেন ভেবে পান না। দরজাকে কী ভাষায় ব্যক্ত করলে সেটা তাঁর ভায়ের মগজে গিয়ে খুলবে, তা তিনি বুঝতে পারেন না। কী করা যায় দরজাকে, কতো রকমে করা যায়, দরজার প্রতি আমাদের কী কী কর্তব্য, আর কিভাবে করলে তা ঠিক-ঠিক পালিত হয়, কেমন করে বললে দরজা আর গোবরাকে এক সঙ্গে কায়দায় আনা যায়, তার হাড়হদ্দর কিছুই তিনি হদিশ পান না।

'আমি যদি বলি, দরজাটা দে, তাহলে কি তুই খুলে এনে ওটা আমার ঘাড়ে চাপিয়ে দিবি নাকি?' তবু একবার শেষ চেষ্টা হয় তাঁর। দরজার মতো আকাঠ, আর ওই, দরজার মতোই ফাঁকা—তাঁর ভায়ের মাথায় যদি এবার ঢোকে।

'রয়েই গেছে! আমি কেন দিতে যাবো? নিজেই গিয়ে নাও না! দরজা তো আর পালিয়ে যাচ্ছে না! দেনদার নয় কিছু যে পালিয়ে-পালিয়ে বেড়াচ্ছে! দাঁড়িয়েই রয়েছে তোমার সামনে। এগিয়ে গিয়ে নিজের হাতে নিলেই হয়।'

'হয়েছে, বুঝতে পেরেছি।' হতাশভাবে ঘাড় নাড়েন হর্ষবর্ধন: 'দরজাকে আর ঘাঁটিয়ে কাজ নেই। থার্মোফ্লাস্ক্ থেকে একটু গরম চা ঢেলে দিতে পারবি—এক পেয়ালা? ঠাণ্ডায় জমে কুল্পি বরফ হয়ে গেলাম!'

'এই তো বেশ কথা! একেবারে পষ্ট! এর মধ্যে কোনো ছুতো নেই। ছুতোর-মিস্তিরিও আসে না।' গোবরা ফ্লাস্ক্ থেকে গরম চা ঢালতে থাকে। সহাস্যে দাদাকে পেয়ালাটা এগিয়ে দেয়।

'আঃ! বাঁচলাম! আরেক পেয়ালা দে।'

গোবরা আরেকটা পেয়ালা এনে দাদার কাছে রাখে। খালি পেয়ালা।

'আমি কি খালি পেয়ালা চেয়েছি?' চায়ের মতোই গরম হয়ে ওঠেন হর্ষবর্ধন—'চা চাইলাম না?'

তাঁর ইচ্ছে করে যে, পেয়ালাটি দিয়ে এমন এক ঘা লাগান যে গোবরার মাথায় গোবর ফাঁক হয়ে যায়। আর সেখানে, ঘিলুর জায়গায়, এখনো নরম আছে, না, বিল্‌কুল্ ঘুঁটে হয়ে গেছে, সেটা লক্ষ্য করেন।

'চা চাচ্ছো তো চেঁচাচ্ছো কেন?' গোবর্ধন আধ ডজন পেয়ালা plus ফ্লাস্ক্, সেই সঙ্গে গোটা তিনেক গ্লাস এনে দাদার সামনে ধরে

দেয়।—'এই নাও, ঢালো আর খাও। যতো তোমার প্রাণ চায়। খাও আর ঢালো! কে মানা করছে?'

দাদার হয়ে ঢালাঢালি করা—অতো ঢলাঢলিতে তার কাজ নেইকো আর। বলে এক কথা, বোঝাতে চায় আরেক, এমন দাদার মর্ম বোঝা তার কর্ম নয়! দেদার লোক সে দেখেছে, কিন্তু দাদার মতন একটিও না। দাদ আর দাদা, দেখা গেল, এ-জীবনে দুই-ই দুর্বিষহ।

'যাঃ, দূর হয়ে যা আমার সুমুখ থেকে। চোখের সামনে থাকিসনে আর!' বলে দাদা ফ্লাস্‌ক্‌ খালি করতে লাগলেন—'যাচ্ছিস যে? কোথায় যাচ্ছিস?'

'নীচে গিয়ে নিঝ্‌ঞ্ঝাটে পড়ি গে। তোমার আপিস-ঘরে তো তুমি আর আসছো না এখন?'

'প্রাণ থাকতে না। মানে, তুই থাকতে নয়।'

'আমি মরে গেলেই তুমি বাঁচো বুঝি? খুশি হও খুব?' গোবরার মুখ গোম্‌রা হয়।—'আমি তোমার ভাই না? এক মায়ের পেটের ভাই নই?'

'তাই কি আমি বলেছি? বললাম তো প্রাণ থাকতে নয়! তুই সেখানে থাকতে আমি নামছিনে, এই কথাই তো বললাম! তার মানে তুই-ই আমার প্রাণ! প্রাণের ভাই যাকে বলে!'

'কিন্তু তুমি অনায়াসে নিজের প্রাণহানি করতে পারো, নিজের প্রাণের প্রতি তোমার কিচ্ছু দরদ নেই। তোমাকে আমার বিশ্বেস হয় না। তোমার থেকে দূরে থাকাই আমার ভালো।'

'থাক্‌গে তাই! তোর ওই বই নিয়ে যতো দূরে-দূরে থাকিস ততই ভালো।' দাদা হাঁফ ছাড়েন: 'আমার কি! তোর ভালোর জন্যই বলছিলাম। ওই লোকটার বই পড়লে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড গুলিয়ে যায়, কাণ্ডজ্ঞান-ট্যান সব লোপ পায়। তোর মঙ্গলের জন্যই বলছিলাম তাই। যাক তুই যখন শুনবিনে তখন···ভালো কথা, আপিস ঘরে

বসেই পড়ছিস তো ? আমার একটা জরুরী ট্রাঙ্ক-কল আসবে খেয়াল থাকে যেন। টেলিফোনের দিকেও কানটা রাখিস, সব মনটা বাইরে দিয়ে বসে থাকিসনে যেন।'

আপিস-ঘরের আলো জ্বেলে টেবিলের ওপর পা তুলে বই নিয়ে বসলো গোবরা। কিন্তু কান একদিকে, মন একদিকে রেখে বই পড়া যায় না। গল্প যদি বা উৎকর্ণ হয়ে শোনা যায়, সেইভাবে পড়া যায় কি ? ট্রাঙ্ক-কলের হাঙ্গামাটা আগে-ভাগেই চুকিয়ে ফেললে হয় না ? গোবরা ভাবে।

একটু পরেই ওপরে গিয়ে সে খবর দেয়—'তোমার ট্রাঙ্ক-কল এসে গেছে দাদা !'

'সে কি রে ! এতো তাড়াতাড়ি ? এমন চট্পট্ মিলে গেল কনেক্‌সন্ ?'

'আমিই কনেক্‌সন্ করে দিলুম। টেলিফোন করে সটান্।'

'তাই নাকি ? তা বেশ করেছিস। তুই তাহলে এখন ওপরেই থাক—এখানে বসে বসেই পড়্ না হয়। ততক্ষণে আমি কলটা সেরে আসি। কেমন ? কাজের কথার মাঝে তোর মাথা গলাবার দরকার নেই।'

'দায় পড়েছে গলাতে। গলার ওপর একটি তো মোটে মাথা আমার' গোবর্ধন জানায়।—'তাকে আমি গলাতে দিতে চাইনে। আমার মাথা মাখম নয়।'

গলার ওপরে বটে, কিন্তু মাথা কিনা সে-বিষয়ে ঘোরতর সংশয় থাকলেও হর্ষবর্ধন দ্বিরুক্তি করার জন্য দাঁড়ান না। ট্রাঙ্ক-কল ধরতে দৌড়ান।

'হ্যালো ? আমিই ট্রাঙ্ক-কল চেয়েছিলাম—'তিনি হাঁকেন—'হ্যালো …হ্যালো……..'

'ও আপনি ? বলুন তো কি রকম ট্রাঙ্ক চাই আপনার ?'

'কি রকম ট্রাঙ্ক? তার মানে!' তিনি একটু অবাক হন—'আমি তো গৌহাটি চেয়েছি। তবে দিল্লীর থেকেও একটা ট্রাঙ্ক আসবার কথা আছে বটে। এটা কি তবে দিল্লীর ট্রাঙ্ক?'

'ষ্টিল ট্রাঙ্ক? হ্যাঁ, তাও আছে আমাদের কাছে। কতো বড়ো, কি সাইজের চাই আপনার বলুন দেখি?'

'ইস্‌টিল ট্রাঙ্ক? সে আবার কি?' হর্ষবর্ধনের মগজে ঠিক ঢোকে না।

'আজ্ঞে, ষ্টিল্ ট্রাঙ্ক যেরকম হয়। ক-ফুট লম্বা, কতো চওড়া—কি রঙের—কিরকম, কেমনটি চাই, দয়া করে যদি জানান—'

'ভারী যে লম্বা-চওড়া কথা শোনাচ্ছেন মশাই? কে আপনারা তা জানতে পারি?'

'বেন্টিঙ্ক ষ্ট্রীটে আমাদের ষ্টিল ট্রাঙ্কের আড়ত, তা কি আপনি জানেন না? কলকাতার সবচেয়ে নামজাদা ষ্টিল ট্রাঙ্কওয়ালা আমরাই তো।'

'ট্রাঙ্ক যাক্ জাহান্নামে! ইস্‌টিল ট্রাঙ্কের নিকুচি করেছে! কে চেয়েছে আপনাদের ইস্‌টিল ট্রাঙ্ক?'

'কেন আপনিই তো? একটু আগেই তো আমাদের টেলিফোনে ডাকলেন! একবারটি আমাদের ট্রাঙ্ক নিয়ে পরীক্ষা করে দেখুন না! পছন্দ না হয়, ফেরত দেবেন। আমাদের মতন এমন মজবুত ট্রাঙ্ক আর কেউ বানাতে পারবে না মশাই। সে-বিষয়ে আমরা গ্যারান্টি দিয়ে থাকি। দয়া করে আমাদের দোকানে পায়ের ধুলো দিয়ে দেখে যাবেন একবারটি? যে ধরনের ট্রাঙ্ক আপনি চান—'

'দেখতে চাইনে আপনাদের ট্রাঙ্ক! আপনারা জাহান্নামে যান।' বলে রিসিভার ফেলে তিনি উঠে আসেন ওপরে। নিজের ঘরে গোবরার ঘাড়ে গিয়ে পড়েন।

'তুই—তুই—তুই—' ভাই-এর দিকে তাকিয়ে রাগে তাঁর কথা বেরোয় না—'তুই একটা যাচ্ছেতাই।'

'কেন কী হলো? ওদের ট্রাঙ্ক বুঝি পছন্দ হলো না তোমার ফোন গাইডে কিন্তু ট্রাঙ্কওয়ালাদের তালিকায় ওদের নামই সবার উপরে দেখলাম।'

'তুই—তুই—তুই দূর হয়ে যা আমার সামনে থেকে। এক্ষুণি—এই দণ্ডে। নইলে—নইলে আমি তোকে খুন করবো।' মারমূর্তি দেখা যায় দাদার: 'ভাগো হিঁয়াসে······এক নম্বরের গাধা! চলে যাও···যেখানে তোমার খুশি। যেদিকে

দুচোখ যায়। ইস্টুপিট—বিচ্ছিরি—উজবুক কাঁহাকা! গোল্লায় যা তুই।'

আর বলতে হয় না। বলতে না বলতেই গোবরা লাফিয়ে ওঠে :
'বললে তো তুমি? তুমিই বললে! তবে আর আমার দোষ নেই!
আমাকে কোনো দোষ দিতে পাবে না।'

বলেই না সে এক লাফে তাকের দিকে এগোয়। ভাঁড়ের
রসগোল্লার ভাঁড়ারে হাত বাড়ায়। রসগোল্লাদের ওপর তার দাঁত
বসায় বত্রিশ পাটি।

'গোল্লায় যেতে বললে তো? কিন্তু যাই বলো, গোল্লার মধ্যে তো
আর যাওয়া যায় না। তাই গোল্লাই আমার মধ্যে যাক।' বলে
দাদার গোল গোল চোখের সুমুখে, দাদার চোখের মতোই গোলাকার—
রসে টইটম্বুর—পৃথিবীর সবচেয়ে মিষ্টি গোলমালকে সে গিলতে থাকে
টপাটপ্।

যেমন গোলোযোগ, তেমনি আবার নিখর্চার জলযোগও তাকে
বলা যায়।

মামির বাড়ির আবদার

'রাণাঘাট যাবে বলেছিলে, কখন বেরুবে?' গোবর্ধন এসে দাদাকে শুধালো: 'মামার বাড়ি যাবে না, আজকে?'

'যাবোই তো।' জবাব দিলেন হর্ষবর্ধন: 'যা, তোর বৌদির কাছ থেকে কিছু টাকা নিয়ে আয়। ট্রেন ভাড়া লাগবে না?'

গোবরা ছুটলো বৌদির কাছে। হর্ষবর্ধন পেছন থেকে হাঁক দিলেন—'তোর বৌদিকে তৈরী হতে বল্। সেজেগুজে তৈরী হয়ে নিক, বুঝলি?'

গোবরা একখানা একশো টাকার নোট নিয়ে ফিরে আসে—'এতে কুলোবে? জিগ্যেস করছে বৌদি।'

'ঢের ঢের।' জানালেন দাদা: 'আমার কাছেও তো খুচরো কিছু রয়েছে। তাতেই ট্যাক্সি ভাড়া হবে। চাইকি'—বলে একটু মুচকি হাসলেন হর্ষবর্ধন—'এই ফাঁকে এই টাকাতেই তোদের মামির বাড়িও ঘুরিয়ে আনতে পারি।'

'মামির বাড়ি?' গোবরা শুনে তো অবাক: 'মামির বাড়ি কি আবার আলাদা জায়গায় নাকি?'

'মামি দেখেছিস কখনো?'

'দেখবো না কেন? মামার সঙ্গেই দেখেছি মামিকে। এক জোড়া মামা মামিকে একসঙ্গে। একবার নয়, অনেকবার।'

'আরে, সে মামি নয় রে, মুখ্যু। এ হচ্ছে সেই মামি, যে মামির মামা নেই। মামা হয় না।'

'যাঃ, তা কি কখনো হতে পারে?' গোবরার বিশ্বাস হয় না। মামারা হচ্ছে কবিদের মতোই বরন্ (born)। যেমন কিনা হয়ে থাকে বরন্ পোয়েট। মামাজ্ আর বরন্, বাট মামিজ্ আর মেড। মায়ের ভাই হয়ে জন্মাতে পারলেই মামা হয়, কিন্তু অনেক ঘটা

করে মামিদের আনতে হয়। মামা বিয়ে করলে তবেই হয় মামি। মামাকে যে বিয়ে করে সেই হচ্ছে মামি। মামি কিছু দাঁতের মতো আপনার থেকে গজায় না।

'আরে, সে মামি নয় রে, সে মামি নয়। মিশরের মামি।'

'মিশর আবার কে? শুনিনি তো। মিশর কোন্ মামা গো?'

'মিশর আমাদের কোনো মামা নয়। যাদুঘরে থাকে যে মিশরের মামি, সে-ই মামি—আজ তোদের দেখিয়ে আনবো, চ। মামির বাড়ি হয়ে তারপরে মামার বাড়ি যাবো।'

যাদুঘরে গিয়ে মামি দেখে তো গোবরার বৌদি হতবাক।—'ওমা, এই তোমার মামির ছিরি! এই তোমার মিশরের মামি?'

'মড়া যে। অনেকদিন আগেই মারা গেছে। মারা গেলে কি আর চেহারা থাকে?' হর্ষবর্ধন বলেন; 'ওষুধ লাগিয়ে এমন রেখেছে।'

'বাসি-মড়া—তাই বলো। রীতিমতন বাসি-মড়া।'

মামির কফিনের গায়ে একটা টিকিট লাগানো ছিলো, তাতে লেখা —B. C. 2299; গোবরা সেইদিকে দাদার দৃষ্টি আকর্ষণ করে—'এটা কি, দাদা? কিসের নম্বর?'

দাদারও চোখে পড়েছিলো সেটা। তিনি মাথা নেড়ে বললেন—'এটা আর বুঝতে পারছিস নে, হাঁদা?' বুঝিয়ে দেন দাদা: 'যে মোটরচাপা পড়ে মেয়েটা মরেছিলো, এটা সেই গাড়ির নম্বর।'

'আহা-হা! মোটরচাপা পড়ে মারা গেলো, মেয়েটা?' শ্রীমতী হর্ষবর্ধনের শুনে দুঃখ হয়: 'এই জন্যেই বলি তোমাদের—সাবধানে চারধারে দেখে—হুঁসিয়ার হয়ে পথ চলতে। তা কি তোমরা আমার কথা শুনবে? এখন, এই দেখে যদি শিক্ষা হয় তাহলেও বাঁচি।'

'হেঁ হেঁ, আমায় আর কোনো মোটরেকে চাপা দিতে হয় না।'

কথাটা হেসেই উড়িয়ে দেন হর্ষবর্ধন: 'বপুখানা দেখেছো তো? কোনো মোটর ভুলে আমার সঙ্গে লড়তে এলে নিজেই উল্টে পড়বেন—' বলে হাসতে হাসতে হর্ষবর্ধন একটা সিগারেট ধরালেন।

'কোনো লরী?' গোবর্ধন জানতে চায়: 'লরী আসে যদি?'

'লরী? লরীর সঙ্গে লড়ালড়িতে বোধ হয় আমি পারবো না।'

এমন সময়ে যাদুঘরের এক কর্মচারী এসে বললো—'মশাই, সিগ্রেটটা নিবিয়ে ফেলুন, আপনার।'

'কেন বলুন তো। নিজের পয়সায় খাচ্ছি। আপনার পয়সায় নয়।' হর্ষবর্ধন বলেন: 'মামার বাড়ির, আই মীন, মামির বাড়ির আবদার নাকি?'

'হ্যাঁ মশাই, তাই।' কর্মচারীটি জানান—'মামির ঘরে সিগ্রেট খাওয়া নিষেধ।'

'কেন, খেলে কী হয়?' গোবরা জানতে চায়।

'জরিমানা হয়। পঞ্চাশ টাকা জরিমানা। সামনেই তো নোটিশ ঝুলছে—দেখছেন না?'

সত্যিই তাই। নোটিশ: 'সিগ্রেট খাওয়া দণ্ডনীয়। এখানে সিগ্রেট টানিলে পঞ্চাশ টাকা জরিমানা হইবে।'

নেবানো তো যায় না, সবে ধরিয়েছি মাত্তর। দু'টানও টানিনি এখনও।' হর্ষবর্ধন বলেন: 'এই নিন আপনার জরিমানা!' একশো টাকার নোটখানা ভদ্রলোকের হাতে দেন।

'আমার কাছে তো ভাঙানি নেই।' কর্মচারী বলেন: 'পঞ্চাশ টাকা এখন পাই কোথায়?'

'তাহলে কী হবে? ভদ্রলোকের হয়ে হর্ষবর্ধনই ভাবিত হন: 'তাই তো, কোথায় উনি পাবেন এখন পঞ্চাশ টাকা? গোবরা, তুইও ধরা না হয় একটা। তাহলে ডবল জরিমানা হয়ে ওটার পুরো টাকাটাই কেটে যাবে এখন।'

'কী যে বলো তুমি, দাদা!' শ্রীমান গোবর্ধন ব্রীড়াবনত হয়: 'তোমরা হলে গুরুজন। তোমাদের সামনে আমি কখনো সিগ্রেট টানতে পারি? আড়ালে আবডালে হলে না হয়—'

'তাহলে তুমিই এক টান টানো না হয়, গিন্নী! টেনে ছাখো না একবার।'

'মরণ আর কি।' হর্ষবর্ধনের বৌএর মুখ ব্যাজার হয়।

'তবে আর কি হবে? আপনিই একটা সিগ্রেট ধরান তাহলে—' এই বলে নোটখানা আর একটা সিগ্রেট ভদ্রলোকের হাতে দিয়ে বৌ আর ভাইকে নিয়ে হর্ষবর্ধন বাইরে এসে ট্যাক্সিতে চাপেন।

শেয়ালদা ষ্টেশনে পৌঁছে তাঁর খেয়াল হয়। 'ঐ যাঃ আমাদের ট্রেন ভাড়ার টাকা কই? টাকা যা ছিলো তা তো যাদুঘরেই থুইয়ে এসেছি—মামির বাড়ির আবদার রাখতেই গেছে একশো টাকা। এখন কি হবে, তিনখানা রাণাঘাটের টিকিটের দাম সতেরো টাকা সাত আনা—এখন পাই কোথায়? গোবরা, তোর কাছে কিছু আছে নাকি? গিন্নী, তোমার কাছে?'

'ওমা, আমি কোথায় পাবো?' গিন্নী বলেন। 'আমার ট্যাঁকে কি টাকা থাকে? আমার কি ট্যাঁক আছে নাকি!'

গোবরা কিছু বলে না, পকেট উল্‌টে দেখিয়ে দেয়।

'তবেই তো মুস্কিল।' হর্ষবর্ধন মাথা চুলকোন।

'বাড়ি ফিরে যাই দাদা।' গোবরা বাৎলায়।

'পাগল হয়েছিস? মামার বাড়ির জন্যে পা বাড়িয়ে ফিরে যাবো —বলিস কিরে? একবার সেখানে গিয়ে পড়তে পারলে হয়। তখন মামার কাছে চাইলেই হবে। ফিরতি ভাড়ার জন্যে ভাবনা নেই।'

'মামার বাড়ির আবদার—বলেই দিয়েছে।' গোবরা বলে দেয়। 'কিন্তু সমস্যা—এখন যাই কি করে? গিয়ে পৌঁছুই কি করে? আমার কাছে খুচরো যা আছে'—হর্ষবর্ধন এ পকেট ও পকেট হাতড়ে

কুড়িয়ে বাড়িয়ে দেখেন—'তাতে কুললে একটা হাফ টিকিট হয়, তার বেশী হয় না। যাক্, ওই হাফ টিকিটেই হবে। একখানা হাফ টিকিটেই হয়ে যাবে।'

'তুমি বলো কি গো? হর্ষবর্ধনের বৌ আপত্তির সুর তোলে: 'তিনজন সোমত্ত মানুষ—একটা হাফ টিকিটে যাবো আমরা?'

'তা কি কখনো হয় দাদা?' গোবরাও গাঁই-গুঁই করে।

'হয় বই কি! অঙ্কের মাথা থাকলেই হয়। অঙ্কের জোরেই যাওয়া যায়।'

এই বলে হর্ষবর্ধন কথা আর না বাড়িয়ে রাণাঘাটের থার্ড ক্লাসের একটা হাফ টিকিট কিনে আনেন—'একবার তো মামার বাড়ি গিয়ে পড়ি কোনো রকমে, তারপর দেখা যাবে। ফিরবো দেখিস ফার্স্ট কেলাসে।'

রাণাঘাট লোকাল—প্ল্যাটফর্মে ছিলো। একটা খালি কামরা দেখে তাঁরা উঠলেন। উঠে বসলেন বেঞ্চিতে।

হর্ষবর্ধন বললেন—'তোমরা বেঞ্চির ওপরে বোসো না যেন। তলায় ঢুকে যাও, বুঝলে? কেবল আমি একলা বেঞ্চির ওপর বসবো।'

'কেন? তুমি কি লাটসাহেব?'

'আবার জিগ্যেস করে, কেন? টিকিট কই তোমাদের? এক্ষুনি চেকার আসবে, বিনা টিকিটে যাচ্ছো দেখলে ধরে নিয়ে গিয়ে জেলে পুরে দেবে তখন। যাও, ঢুকে পড়ো চট করে। তুইও সেঁধিয়ে যা গোবরা।'

জেলের ভয় দেখিয়ে ভাই আর বৌকে তিনি বেঞ্চের তলায় ঠেলে দেন। নিজে বসেন বেঞ্চির ওপরে গ্যাঁট হয়ে। গাড়িও ছেড়ে দেয়।

কয়েক ষ্টেশন যেতে না যেতেই পাশের কামরা পেরিয়ে চলতি গাড়িতেই চেকার এসে ওঠে—'টিকিট দেখি।'

হর্ষবর্ধন টিকিট দেখান।

'হাফ টিকিট—একি?' চেকার তো অবাক: 'এতোবড়ো বুড়ো ধাড়ি হয়ে হাফ টিকিটে যাচ্ছেন—সে কি মশাই?'

'কেন যাবো না?' হর্ষবর্ধন প্রতিবাদ করেন: 'অঙ্কের জোরেই তো যাচ্ছি।'

'অঙ্কের জোরে, সে আবার কি? বুঝতে পারলাম না তো।'

'অঙ্কের মাথা থাকলে তো বুঝবেন? বেঞ্চির তলায় একবার তাকিয়ে দেখুন, বুঝবেন তাহলে।'

চেকার বেঞ্চির তলায় চোখ চালান—সেখানে আরো দু'জন গাদাগাদি হয়ে বসে রয়েছে দেখতে পান। ঠিক বসে নয়—শোয়া বসার মাঝামাঝি অবস্থায় ঠাসাঠাসি হয়ে—ঘাড় হেঁট করে।

'এখানে এমন করে বসে কেন ? টিকিট দেখান আপনাদের।'

'টিকিট নেই তো।' গোবর্ধন কাতরস্বরে বলে : 'টিকিট নেই আমাদের।'

ওপরে হাফ টিকিট, নীচে একেবারে টিকিট নেই—ভারী তাজ্জব ব্যাপার। টিকিট চেকার তো থ—'বিনাটিকিটে যাচ্ছেন যে বড়ো ?'

'বিনা টিকিটে কেন ? এই তো টিকিট রয়েছে। আমার হাতেই আছে, দেখছেন না ?' হর্ষবর্ধন দেখান : 'এতোক্ষণ তাহলে কী দেখছেন মশাই, আপনি ?'

'ও তো হাফ টিকিট। ওই টিকিটেই তিনজনা যাচ্ছেন নাকি ?'

'যাচ্ছিই তো, অঙ্কের জোরেই যাচ্ছি।' হর্ষবর্ধনের এক কথা—'আলবাৎ যাচ্ছি।'

'মামার বাড়ির আবদার নাকি ?' চেকার নিজেকে আর চেক করতে পারেন না, গর্জে ওঠেন।

'মামির বাড়ির বলতে পারেন, বরং।' গোবর্ধন তলার থেকে কুঁই-কুঁই করে—বেঞ্চির সঙ্গে লেপটে থেকে—'মামার বাড়ির আবদার তো পরের কথা, সেখানে গিয়ে হবে।'

'বলি মশাই', হর্ষবর্ধন বলেন : 'একের তলায় দুই থাকলে কী হয়, তা জানেন না ? তিন হয়, না, হাফ হয় ? মাথা মাটি করে কোনো দিন মাথামাটিক্‌স্ শেখেন নি, ইস্কুলে ? একের তলায় দুই থাকলে চিরকাল হাফ হবে—অঙ্কের এই নিয়ম। বেঞ্চির ওপরে একলা আমি, বেঞ্চির তলায় দু'জন—হাফই তো হবে। হাফ টিকিটেই তো যাবো আমরা !' এই বলে হর্ষবর্ধন হাঁফ ছাড়েন। ট্রেনও রাণাঘাটে এসে হাঁফাতে থাকে।

কাল থেকে গোবর্ধন নীল কাচের দরজায় নজর রেখেছে এবং ওর অন্তরালে কী ব্যাপার হতে পারে তাই নিয়ে অনেক মাথা ঘামিয়েছে—সেই নীল কাচের দরজা ঠেলে ভেতরে গিয়ে প্রত্যক্ষ করার সৌভাগ্য যে কোনোদিন তার জীবনে হবে, এ প্রত্যাশা সে করতে পারেনি। নানা চেহারার, নানা বয়সের, নানা সাইজের হরেক রকম লোককে ওই দরজা ঠেলে যেতে-আসতে সে দেখেছে আর ভেবেছে, বিশ্বসুদ্ধ লোকই কি ঐ বাড়ির বাসিন্দা! কিন্তু এখন কেবল আর এক মুহূর্তের ব্যবধান—একটু পরেই ঐ রহস্যলোকের দ্বার তার কাছে উন্মুক্ত হবে। ডিটেকটিভ বইয়ের শেষ পাতায় এসে কিশোর পাঠকের বুক যেমন কাঁপতে থাকে, গোবর্ধনেরও এখন ঠিক সেই রকমই অবস্থা।

যবনিকা অনাবৃত হলে দেখা যায়, ছোট্ট একখানি ঘর মাত্র। তার মধ্যেই কায়দা করে খান-ছয়েক চেয়ার সাজানো—ছ-টা বিরাট আয়নার সামনে; সব ক'টা চেয়ারেই তখন ক্ষুর আর কাঁচির খুব জোর খচ-খচ! হর্ষবর্ধন ভাবেন, কী আশ্চর্য, এইটুকু ঘরে বিশ্ব-ভারতের আমন্ত্রণ! যাদের মাথা আছে আর মাথায় চুল আছে তাদের কারুরই অব্যাহতি নেই এখানে না এসে, সারা দুনিয়ার দাড়ি কামিয়ে দিচ্ছে এরা! বাহাদুর বটে! গোবর্ধন কী ভাবে বলা যায় না, কী ভাবা উচিত, বোধকরি সেই কথাই তিনি ভাবেন।

যাওয়া-মাত্রই কর্তা-নাপিত এসে দুই ভাইকে সমাদরে অভ্যর্থনা করে, দু'জনকে দুটো কুশন-চেয়ারে বসতে দেয়, একযোড়া মাথা ও গালের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে সবিনয়ে জানায় যে, ও দুটি 'চুলহীন ও নির্দাড়ি' হতে আর সামান্যই বাকি আছে, তার পরেই তাঁদের ওপর হস্তক্ষেপ করা হবে।

কলকাতায় আসার পর এই প্রথম অভিনন্দন লাভ, হর্ষবর্ধন খুশি হয়ে ওঠেন। গোবর্ধনও রীতিমতো বিস্মিত হয়। নীল কাচের নেপথ্য-লোকের যিনি একচ্ছত্র মালিক তাঁর পর্যন্ত কী অমায়িক ব্যবহার! হ্যাঁ, শহরের হলেও এবং হাতে ধারালো ক্ষুর থাকলেও এমনি লোকের কাছেই গলা ও গাল (দাড়ি সমেত) নির্ভয়ে বাড়ানো যায়—এমন কি এর কাঁচির তলায় মস্তক দান করাও শক্ত ব্যাপার নয়।

গোবর্ধন অবাক হয়ে লক্ষ্য করে। সত্যিই, রহস্যলোকই বটে! ওধারের আয়নার ছায়া এধারের আয়নায় পড়েছে, আর কিছুই না, কিন্তু কী আশ্চর্য! একই আয়নার মধ্যে গোবর্ধন দেখছে—একশোটা ঘর, একশোটা আয়না! ঘরগুলো ক্রমশ ছোটো হয়ে হয়ে যেন অনন্তে গিয়ে মিলিয়ে গেছে। অদ্ভুত কাণ্ড! গোবর্ধন ভাবছে এখান থেকে বেরিয়েই দাদাকে প্রস্তাব করবে, এমনি এককুড়ি বড়ো বড়ো আয়না বাড়ি নিয়ে যাবার জন্যে। প্রত্যেক ঘরে দুটো করে মুখোমুখি সাজিয়ে দেওয়া হবে—তাতে ঘরের সংখ্যা বাড়বে, আত্মপ্রসাদও বাড়বে সেইসঙ্গে, অথচ পয়সা খরচ করে ঘর বাড়াতে হবে না। বাড়িতে যে আয়নাটা আছে তার সামনে দাঁড়িয়ে গোবর্ধন এখন কেবল আর একটা গোবর্ধনকে মাত্র দেখতে পায়, কিন্তু এইরকম পলিসি করলে তখন একশোটা গোবর্ধনকে একসঙ্গে দেখতে পাওয়া যাবে—গোবর্ধনের সামনের চেহারা আর পেছনের চেহারা যুগপৎ! কী মজাই না হবে তাহলে!

যাদের চুল দাড়ির গতি হচ্ছিলো, হর্ষবর্ধন বসে বসে তাদের ভাবগতিক দেখছিলেন। অবশেষে তিনি ফিস্ ফিস্ করতে বাধ্য হন—'গোবরা, দেখছিস, লোকগুলোর মুখের ভাব হাসি হাসি নয় কিন্তু!'

'চুল ছাঁটা কি হাসির ব্যাপার, দাদা!'

'জানি, গুরুতর ব্যাপার; কিন্তু তাই বলে এতোখানি গোমড়া মুখ করতে হবে, এই বা কী কথা?'

গোবরা অভিনিবেশ সহকারে পর্যবেক্ষণ করে—'হুঁ, লোকগুলো যেন হাল ছেড়ে দিয়ে বসে আছে!'

হর্ষবর্ধন সায় দেন—'যা বলেছিস! হাল আর মাথা তুই-ই হলো এক জিনিস, দুটোরই কর্ণ আছে কিনা! মাঝিকে বলে কর্ণধার—শুদ্ধ ভাষায়, জানিস?'

গোবর্ধন গম্ভীরভাবে মাথা নাড়ে—'নাপিতকেও বলা যায় ওই কথা। কর্ণধার তো বটেই, তা ছাড়া নাপিতের ক্ষুরেও ধার!'

একটা আয়নার চেয়ার খালি হয়, হর্ষবর্ধনের আমন্ত্রণ আসে। গোবরা ত্যাগীর ভূমিকা নেয়—'দাদা, তুমিই ছাঁটো আগে, আমার পরে হবে।'

হর্ষবর্ধনের ভাই-অন্ত প্রাণ, ভাইকে ছেড়ে কোনো কাজে তাঁর মন সরে না। একসঙ্গে ট্রেনে উঠেছেন, ট্রেন থেকে নেমেছেন, মোটর চেপেছেন, কলকাতার সমস্ত অভিজ্ঞতাই তাঁরা একসঙ্গে আস্বাদ করছেন, অথচ চুল-ছাঁটার আনন্দ একা তাঁকেই প্রথম উপভোগ করতে হবে! ভাইয়ের দিকে তাকিয়ে তাঁর মুখ কাঁচুমাচু হয়—'বেশ, তুই না হয় আগে দাঁত তোলাস।' তারপর কি ভাবেন খানিক্ষণ—'আমি না-হয় দাঁত তোলাবই না!' হ্যাঁ, গোবরার দাদৃ-ভক্তির বিনিময় তিনি অবশ্যই দেবেন, দাঁত তোলার আনন্দ থেকে তিনি কঠোরভাবে নিজেকে বঞ্চিত রাখবেন। ভাইয়ের জন্যে বিরাট ত্যাগ স্বীকার করে তাঁর প্রাণ চওড়া হয়ে ওঠে। গোবরা দাদৃ-ভক্ত সন্দেহ নেই, কিন্তু তাঁর ভ্রাতৃভক্তির তুলনাই কি পৃথিবীতে আছে?

চেয়ারে বসে চুল-ছাঁটানো হর্ষবর্ধনের জীবনে এই প্রথম। চুল-ছাঁটার কথা শুনলেই চিরকাল তাঁর গায়ে কাঁটা দিয়ে এসেছে, আর দাড়ি কামানোর সময়ে মনে হয়েছে, চীনেম্যানরাই পৃথিবীতে সুখী। চীনে দাড়ির প্রাদুর্ভাব কম, হর্ষবর্ধনের ধারণা, সে দেশে বৌদ্ধধর্ম প্রসারের এই হচ্ছে একমাত্র কারণ।

হ্যাঁ, দাড়ি কামানোর সময়ে হর্ষবর্ধনের মনে হয়েছে, এরচেয়ে চীন দেশে জন্মানো ভালো ছিলো। আসামের গাছপালা রেহাই পেতো তিনিও রেহাই পেতেন। দেশি নাপিতকে যদি বলেছেন—'দাড়িটা আর একটু ভিজিয়ে নাও হে—বড়ো লাগছে, অমনি তার জবাব পেয়েছেন, 'দরকার হবে না, বাবু—আপনার নয়ন-জলেই সেরে

নিতে পারবো।' বাধ্য হয়ে নিজের দাড়ির উপর অশ্রুবর্ষণ করতে হয়েছে। যদি বলেছেন, 'তোমার ক্ষুরটা ভারি ভোঁতা, বাপু!' অমনি বাপুর উত্তর—'ডবল খাটুনি হলো, তার দ্বিগুণ মজুরি দিন তবে।' সুতরাং আর-এক দফা অশ্রুবর্ষণ। আর চুল ছাঁটার কথা না তোলাই ভালো। উবু হয়ে বসে খবরের কাগজের মাঝখানে ফুটো করে মাথা গলিয়ে ঝাড়া দু'ঘণ্টা সে কী কর্মভোগ! চুলের সঙ্গে

কাঁচির সে কী ঘোরতর সংগ্রাম—আবার অনেক সময়ে ঠিক চুলের সঙ্গেই না, মাথার খুলি, কানের ডগা, খোদ হর্ষবর্ধনের সঙ্গেও কাঁচির খোঁচা খেয়ে হর্ষবর্ধন ক্ষেপে ওঠেন; ইচ্ছা হয়—নাপিতকে মনের সাধে দু'ঘা দেন কষিয়ে—কিন্তু দারুণ বাসনা তিনি দমন করে ফেলেন। নাপিতকে মারা আর আত্মহত্যা করা এক কথা, কেননা এমন সুযোগ প্রায়ই আসে, যখন নাপিতের ক্ষুর আর গলার দূরত্ব খুব বেশী থাকে না। অনেক ভেবে হর্ষবর্ধন নাপিতকে মার্জনা করে ফেলেন। বিবেচক হর্ষবর্ধন।

কিন্তু প্রাণ নিয়ে পরিত্রাণ পেলেও চুল নিয়ে কি পরিত্রাণ আছে সে-সব নাপিতের কাছে? অনেক ধস্তাধস্তি করে মাথায়-মাথায় হয়তো রক্ষা পান, কিন্তু চুলের অবস্থা দেখে হর্ষবর্ধনের কান্না পায়—আয়নায় যেটুকু স্বচক্ষে দেখা যায়, সে তো শোকাবহ বটেই, আর যে অংশ 'পরস্ব' চোখে জানতে হয় তার রিপোর্টও কম মর্মভেদী নয়। এধারে খপচানো, ওধারে খপচানো, কাকে-ঠোকরানো, বকে-ঠোকরানো—যতো দিন না চুল বেড়ে আবার ছাঁটবার মতো হয়েছে ততো দিন সে মাথা মানুষের কাছে দেখালে মাথা কাটা যায়। এজন্যে কাঁচি হাতে নাপিতের আবির্ভাব দেখলেই হর্ষবর্ধনের জ্বর আসে, মাথা ধরে, ঘাম হয়, পেট কামড়াতে থাকে—ঠিক যে-সব উপসর্গ ছেলেবেলায় পাঠশালায় যাবার সময়ে অনিবার্যরূপে দেখা দিতো।

কিন্তু সে চুল ছাঁটার সঙ্গে এ চুল ছাঁটার তুলনাই হয় না। এ কেমন চেয়ারে বসে সাদা চাদর জড়িয়ে (যাতে একটিমাত্র পলাতক চুলও তোমার কাপড়-জামার মধ্যে অনধিকার প্রবেশ না করতে পারে) দস্তুরমতো আরাম! ঘণ্টাখানেক চোখ বুজে ঘুমিয়েও নিতে পারো, জেগে দেখবে তোফা চুল ছেঁটে দিয়েছে—কচুয়ানদের মতো। তুমি কচুয়ান নও বলে যে, তোমাকে কম খাতির করবে তা নয়—কোনো রকম উচ্চ-নীচ নেই, এ সব শহুরে নাপিতের কাছে। যে ঘোড়ার

গাড়ি হাঁকায় না তাকেও এরা মানুষ বলেই গণ্য করে। কেন হর্ষবর্ধনকে কি এরা কম মর্যাদা দেখিয়েছে? ঢোকামাত্রই কতো সাদর সম্ভাষণ—ডেকে চেয়ারে বসানো—সম্বর্ধনা কি কিছু কম করেছে ওরা? তবু তো হর্ষবর্ধন কচুয়ান নন! হর্ষবর্ধন গ্যাঁট হয়ে বসেন চেয়ারে, আরামে গা এলিয়ে দেন। মাথার উপরে হু-হু করে পাখা ঘুরছে—সম্মুখে নিজের চেহারা দেখবার সুবর্ণ সুযোগ—হর্ষবর্ধন স্বর্গসুখ উপভোগ করেন। মুখখানা হাসি-হাসি করে তোলার সাধ্যমতো চেষ্টা করেন তিনি। নাপিত একটা নতুন ধরনের কাঁচি হাতে নেয়, কাঁচির কলেবর দেখে হর্ষবর্ধন অবাক হন। কাঁচি না বলে তাকে চিরুনিও বলা যায়। তার মুখের দিকে চিরুনির মতো দাঁত আর হাতলের দিকটা অবিকল কাঁচি! হর্ষবর্ধন মনে মনে বস্তুটির নামকরণ করেন—'কাঁচিরুনি'। নাপিতকে প্রশ্ন করেন-- 'অদ্ভুত কাঁচি তো!'

'কাঁচি নয় ক্লিপ।' নাপিত উত্তর দেয়। 'পেছনটা ক্লিপ-ছাঁটা করবো তো?'

'যেমন কলকাতার দস্তুর তাই করো।'

ঘাড়ের পেছনে ক্লিপটা চলতে থাকে। হর্ষবর্ধন শিউরে শিউরে ওঠেন। যন্ত্রটা তেমন আরামদায়ক নয়। যেন চামড়া একেবারে চেঁছে নেয়, চুলগুলোকে যেন গোড়া থেকে সমূলে উপড়ে তোলে। কখনও ঘাড় কোঁচকান কখনও টান করেন, কখনও কাৎ করেন, কিন্তু কিছুতেই তিনি সুবিধা করতে পারেন না। অবশেষে মরীয়া হয়ে তিনি লাফিয়ে ওঠেন—'থামাও, তোমার কিলিপ! ঘাড় যে গেলো, আমার। এ যে দেখছি, আসামী-কাঁচির বাবা!'

নাপিত ঘাড় ধরে বসিয়ে দেয়, কোনো উচ্চবাচ্য করে না। তার অনেকদিনের অভিজ্ঞতা। পাড়াগেঁয়ে যারা প্রথম চুল ছাঁটায় তারা সবাই এই রকমই করে কিন্তু পরে আবার তারাই চেহারার খোলতাই দেখে খুশি হয়ে আশাতীত বখশিস দিয়ে ফেলে। ক্লিপ চলতে থাকে,

হর্ষবর্ধন একবার কাতর নেত্রে গোবর্ধনের দিকে দৃষ্টিপাত করেন, কিন্তু কী করবেন, ভাগ্যের কবল থেকে কারুর কি নিষ্কৃতি আছে। তিনি অসহায়ভাবে আত্মসমর্পণ করেন। গোবরা তাকিয়ে দেখে, দাদার হাসি-হাসি মুখভাব বেশ কাঁদো-কাঁদো হয়ে এসেছে এখন। নাপিতের হাত থেকে তাঁকে ছিনিয়ে নিয়ে নীল দরজা ভেদ করে সবেগে প্রস্থান করবে কি না সে ভাবতে থাকে। আপন মনে গজরায়—'আসলে হলো খুরপি, নাম দিয়েছেন কিলিপ। তা, খুরপি চালাবে তো বাগানে চালাও গে, পরের ছেলের মাথায় কেন, বাপু?'

পেছনে শেষ করে সামনে ছাঁটা শুরু হয়, ক্লিপের স্থান অধিকার করে কাঁচি। সামনের চুল যেমন তেমনই থাকে, কেবল ডগাগুলো সামান্য ছেঁটে সমান করে দেওয়া হয়। কাজ সমাধা হয়েছে জানিয়ে, পছন্দ হয়েছে কি না নাপিত প্রশ্ন করে। হর্ষবর্ধন সেই প্রশ্ন গোবর্ধনের প্রতি নিক্ষেপ করেন।

গোবর্ধন প্রাণপণে পর্যবেক্ষণ করে, কিন্তু চুল-ছাঁটাটা কোন্ জায়গায় হলো খুঁজে পায় না। সামনের চুল তো ছোঁয়াই হয়নি আর পেছনটা দিয়েছে খুরপি দিয়ে একদম ন্যাড়া করে। সমান করে আঁচড়ালে সামনে দাড়ি পর্যন্ত ঢাকা পড়বে—নাক মুখই দেখতে পাওয়া যাবে না, পেছনে তো মাথার খুলিই বেরিয়ে পড়েছে, তবে শাদা চামড়া ঢাকতে গেলে পরচুলোই পরতে হয় কি না, কে জানে। গোবরা স্বাধীন অভিমত দেয়—'দাদা, তোমার পেছনে দিয়েছে দাড়ি কামিয়ে, আর সামনে? সামনে তো তুমি দেখতেই পাচ্ছো।'

'হুঁ, সামনেটা একটু কামানো দরকার।' হর্ষবর্ধন মন্তব্য করেন। কিন্তু হঠাৎ তাঁর আশঙ্কা হয়, কমাতে বললে হয়তো কাঁচি ছেড়ে ক্লিপ দিয়ে কামাতে শুরু করে দেবে। ভয়াবহ যন্ত্রটার দিকে বঙ্কিম কটাক্ষ করে তিনি বলেন—'না, থাক।'

'তাহলে হেয়ার ড্রেস করি?' নাপিত হর্ষবর্ধনের অনুমতির

অপেক্ষা করে। হর্ষবর্ধন মনে মনে আলোচনা করেন, হেয়ার মানে তো চুল, অবশ্য খরগোসও হয় কিন্তু! এখানে চুলই হবে, কিন্তু ড্রেস করবে—সে আবার কী! চুলে কাপড় পরাবে নাকি? তিনি ভয়ে-ভয়ে প্রশ্ন করেন—'কিলিপের ব্যাপার নয় তো?'

'না না, মাথায় গোলাপ জল দিয়ে—'

'তা দাও, দাও।' ঘাড়ের পেছনটা তখন থেকে ভারি জ্বলছিলো, জল পড়লে হয়তো ঠাণ্ডা হতে পারে ভেবে হর্ষবর্ধন উৎসাহিত হয়ে ওঠেন। 'আচ্ছা, চুল না ছাঁটালে বুঝি তোমরা গোলাপ-জল খরচ করো না—না?' নাপিত ঘাড় নাড়ে। 'করো। বটে? আহা, তা জানলে আমি ড্রেস হেয়ারই করাতাম, তাহলে চুল ছাঁটতো কোন্ হতভাগা!'

নাপিত গোলাপ-জল দিয়ে চুলগুলো ভিজিয়ে দেয়, দিয়ে চুলের মধ্যে আস্তে আস্তে আঙুল চালায়। হর্ষবর্ধনের আরাম লাগে, ঘুম পায়। কিন্তু ক্রমশই নাপিতের 'ড্রেস হেয়ারের' জোর বাড়তে থাকে, তার আঙুলগুলো যেন হয়ে ওঠে লৌহগঠিত—সে তার সমস্ত বাহুবল প্রয়োগ করে হর্ষবর্ধনের খুলির ওপর। হর্ষবর্ধন লাফাবার চেষ্টা করেন কিন্তু পারেন না, লাফাবেন কী করে? পায়ের জোরে মানুষ লাফায় বটে, কিন্তু লাফাতে হলে পা ও মাথা একসঙ্গে তুলতে হয়। এ ক্ষেত্রে তাঁর শ্রীচরণ স্বাধীন থাকলে কী হবে, মাথা যে নিতান্তই বে-হাত! মাথা বাদ দিয়ে লাফানো যায় না। হর্ষবর্ধন আর্তনাদ করেন—'এ কী হচ্ছে? এ কী হচ্ছে? এ কী রকম তোমাদের ড্রেস হেয়ার? এ তো ভালো নয়!'

খোট্টারা যেমন প্রবল পরাক্রমে বর্তন মলে, গোবর্ধন দেখে, সেই তালেই দাদার ড্রেস হেয়ার চলছে। সে বিরক্তি প্রকাশ করে—'এ কি বেওয়ারিশ মাথা পেয়েছো যে, চটকে-মটকে দিচ্ছো?'

নাপিত এসব কথায় কান দেয় না, তার কাজ করে যায় সে।

কখনও রগ টিপে ধরে, কখনও মাথায় থাবড়া মারে, কখনও সমস্ত চুল মুঠিয়ে ধরে গোড়া ধরে টানে, কখনও দু'ধার থেকে টিপে মাথাটাকে চ্যাপটা করার চেষ্টা করে, কখনও ঘাড় ধরে ঝাঁকুনি দেয়—তার দেহের সমস্ত শক্তি এখন করতলগত। হর্ষবর্ধনের বাধা দেবার ক্ষমতা ক্রমেই কমে আসে, তিনি নির্জীব হয়ে পড়েন। তাঁর ক্ষীণ কণ্ঠ শোনা যায়—'গোবরা, তোর বৌদিকে বলিস, আমি সজ্ঞানে কলকাতা-লাভ করেছি।' এর বেশী আর তিনি বলতে পারেন না। কিন্তু গোবরা বুঝতে পারে—দাদার অবস্থা সঙ্কটাপন্ন, দাদাকে সজ্ঞানে আসাম-লাভ করাতে হলে এই মুহূর্তেই এখান থেকে সটকান দিতে হবে। সে যেন ক্ষেপে যায়—'ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও বলছি—আমার দাদাকে ; নইলে ভালো হবে না!'

নাপিত হতভম্ব হয়ে হস্তক্ষেপ থামায়।

'এমনিভাবে মাথাটাকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলছো, এর মানে কী?'

'চুলের গোড়া শক্ত হয়, এতে।'

'চুলই রইলো না, তো চুলের গোড়া! টেনে টেনে তো অর্ধেক চুল ওপড়ালে, মাথায় চুল কোথায়?'

'এ রকম করলে মাথা ছেড়ে যায়।'

'মাথা ছেড়ে যায়?' গোবরা যেমন অবাক হয়, তেমনি চটে। 'ছেড়ে যায়? ছেড়ে গেলে তুমি জোড়া দিতে পারবে?'

নাপিত কি উত্তর দেবে ভেবে পায় না। গোবরা কণ্ঠে আরো জোর দেয়—'যে মাথা তুমি দিতে পারো না, সে মাথা নেবার তোমার অধিকার কী?'

হর্ষবর্ধন ঘেরাটোপের ভেতর দিয়ে আঙুল বাড়িয়ে ক্লিপটা হাতাবার চেষ্টা করেন—'গোবরা, সহজে না ছাড়ে যদি তাহলে দে এই যন্তরটা ওর ঘাড়ে বসিয়ে! মজাটা টের পাক।...মাথা ছাড়িয়ে দেবেন—ভারি আবদার!'

গোবরা বলে—'না, দরকার নেই ঝগড়াঝাঁটির। এই নাও তোমার মজুরি, দশ টাকা। দেশে চুল ছাঁটতে দশ পয়সা—কলকাতায় না-হয় দশ টাকাই হবে, এর বেশী তো নয়? দাদা, আর দেরী করো না, উঠে এসো! চলো, পালাই!'

দুই ভাই নাপিতকে নিঃশ্বাস ফেলার অবকাশ দেয় না, চক্ষের পলকে সেলুন পরিত্যাগ করে।

বাইরে এসে হর্ষবর্ধন হাঁপ ছেড়ে বাঁচেন। হতাশভাবে মাথায় হাত বুলোন—'সত্যিই তো, টাক ফেলে দিয়েছে! যাক, খুব রক্ষে পাওয়া গেছে! আর-একটু হলে মাথাটাই ফেলে আসতে হতো!'

গোবর্ধন ঘাড় নাড়ে—'এরা পেছনের চুল দেয় দাড়ি কামানো করে আর সামনের চুল দেয় ছিঁড়ে—একেই কি বলে চুল-ছাঁটা? আজব শহরের অদ্ভুত হালচাল।...অ্যাঁ, এতো লোক জমছে কেন চারদিকে?'

দুই ভাইকে কেন্দ্র করে ক্রমশই জনতা ভারি হতে থাকে। হর্ষবর্ধন ফিস-ফিস করে বলেন—'দু'জনের দু'রকম চুল দেখে অবাক হচ্ছে, বোধহয়?'

'উঁহু', গোবরা অনুচ্চকণ্ঠে জানায়, 'তোমার বোরখাটা খুলে ফেলো নি, এতোক্ষণেও?'

পালাবার মুখে ঘেরাটোপ ফেলে আসার অবকাশ সামান্যই ছিলো, কিন্তু সেটাকে তখন পর্যন্ত গায়ে জড়িয়েই রেখেছেন হর্ষবর্ধন। এতোক্ষণে খেয়াল হলো। সত্যিই, লোকে যা বলে মিথ্যে নয়, অদ্ভুত কলকাতার হালচাল! ঘেরাটোপ খুলে ফেলতেই জনতা আপনা থেকেই ছত্রভঙ্গ হয়ে গেলো, কোনো উচ্চবাচ্য করলো না।

চাদরটা গুটিয়ে বগলে চেপে হর্ষবর্ধন বলেন—'এই ছাখ্!' তাঁর হাতে সেই ভয়াবহ ক্লিপটা। 'আমি ইচ্ছে করে আনিনি, পালাবার সময় আমার হাতে ছিলো। কী করবো? ফেরৎ দিয়ে আসি?'

'আর যায় ওখানে?' গোবরা ভয় দেখায়। 'আবার যদি শুরু করে?'

'তবে থাক এটা। দেশে গিয়ে দীনু নাপিতকে দেখাবো। এবার যে ব্যাটা আমার চুল ছাঁটতে আসবে, দেবো এটা তার ঘাড়ে বসিয়ে—তা কলকাতার নাপিতই কি, আর আসামের নাপিতই কি!'

'বেশ করেছো এটা নিয়ে এসে। কলকাতার বহুৎ লোক তোমাকে আশীর্বাদ করবে। অনেকের ঘাড় বাঁচিয়ে দিলে!'

হর্ষবর্ধন মাথা নাড়েন—'যা বলেছিস, তুই। একখানা মানুষ মারা কল!' ক্লিপ দিয়ে একবার পিঠ চুলকে নেন তিনি। 'যাক, ঘামাচি মারা যাবে এটা দিয়ে।'

'বৌদি কাক তাড়াবে এটা দিয়ে। কাকের উৎপাত থেকে বাঁচা যায় তাহলে মানুষ এ দেখলে ভয় খায় আর কাক খাবে না? কী বলো, দাদা?'

'তখন থেকে ঘাড়টা কী জ্বালা করছে! মাথাটাও টাটিয়ে উঠেছে! চুল নিয়ে কি কম টানাটানি করেছে? ইসকুলের সেই যে কি ইসপোর্ট হয়, জানিস? তাই।'

'হুঁ, ওয়ার অব্ টাগ।'

হর্ষবর্ধন ব্যাখ্যা বিশদ করেন—'ওয়ার মানে যুদ্ধ—বালিশের ওয়াড়ও হয়—সে আলাদা ওয়াড়—'

গোবর্ধন বাধা দেয়—'কেন, আলাদা হবে কেন? আমরা ছোটো-বেলায় বালিশ নিয়ে যুদ্ধ করিনি? কতো বালিশের তুলো বের করে দিয়েছি!'

'দূর মুখ্যু, বালিশের ওয়াড় বুঝি ওকে বলে? বালিশের জামাকে বলে বালিশের ওয়াড়, তাও জানিস না? ওয়ার অব্ টাগ—অব্ মানে হলো, 'র' আর টাগ? টাগ মানে কী?'

'কী জানি? টাক-ফাক হবে।'

'তাই হবে বোধহয়। ওয়ারের চোটে প্রায় টাক পড়ে গেলো, আমার! হ্যাঁ, কথাটা হবে ওয়ার অব্ টাক, বুঝলি? লোকের মুখে মুখে 'টাক' 'টাগ' হয়ে দাঁড়িয়েছে।'

গোবরা মুখখানা গম্ভীর করে—'উঃ, কাল থেকে কী টেকো লোকই দেখছি, রাস্তায়! কলকাতায় লোকের এতো টাক কেন হয় এখন বোঝা গেলো।'

'কেন?'

'এইসব দোকানে চুল ছাঁটার জন্যে। দু'বার ছাঁটলেই টাক—একদম চাঁদি পরিষ্কার! চুল ছাঁটলেই চুল ধরে টানতে দিতে হবে—এই হলো কলকাতার নিয়ম।'

'বলিস কি! ভাগ্যিস গোঁফ ছাঁটিনি! তাহলে কী সর্বনাশই না হতো!' হর্ষবর্ধন সভয়ে গোঁফ চুমরান। গোঁফ তাঁর ভারি আদরের এবং এই হচ্ছে তাঁর একমাত্র ব্যক্তিগত সম্পত্তি, যার ভাগ ইচ্ছা থাকলেও তাঁর ভাইকে দেবার তাঁর উপায় ছিলো না।

শাল-দোশালার কাণ্ড

সেদিন সকাল হতেই সদরে কে কড়া নাড়তে শুরু করেছে। ভারি খটাখট্ লাগিয়ে দিয়েছে তখন থেকে।

অনেকক্ষণ সুরমাধুরী উপভোগের পর হর্ষবর্ধন বিচলিত হয়ে গোবর্ধনকে আদেশ করেছেন অবশেষে: 'ভাখ্ তো রে! কার এমন কড়া আওয়াজ! দ্যাখ্ তো!'

দাদার হুকুমের ওয়াস্তাই ছিলো গোবরার। নীচে ছুটে গিয়ে তক্ষুনি সে ফিরে এসেছে রুদ্ধ-নিঃশ্বাসে: 'শাল বেচতে এসেছে একজন!'

'বটে?' শুনেই গুম্ হয়ে গেছেন হর্ষবর্ধন।

'ডাকবো তাকে?' দাদার উচ্চবাচ্যের অপেক্ষা করে গোবরা।

'ডাকবি? দূর পাগল! ভাগিয়ে দে, এক্ষুণি ভাগিয়ে দে!' হর্ষবর্ধন ঠিক হৃষ্ট হতে পারেননি: 'আক্কেল দ্যাখো মানুষের! কামারশালে এসেছে ছুঁচ বেচতে। ছুঁচ বিক্রী করার জায়গা পায়নি। বলে আমাদেরই কতো শালের জঙ্গল—আমরা কেটে উড়িয়ে দিলাম, কতো শাল গাছ উই ধরে খেয়ে গেলো অমনি—আর আমরা কিনা কিনতে যাবো শাল। আচ্ছা উজবুক তো, কলকাতার লোকগুলো!'

'সে গেছো-শাল নয় গো, দাদা!' গোবরা প্রতিবাদ করে: 'মাথায় করে বেচতে এনেছে, বলছি!—'

'আহা, গেছো-শাল না হোক—কেঠো শাল। ও একই কথা! শাল গাছকেই চেলা করে তক্তা বানিয়ে শাল কাঠ হয়। না তো কি, আকাশ থেকে পড়ে নাকি? ও আর এমন কি হাতী-ঘোড়া যে, পয়সা খসিয়ে কিনতে হবে?'

'সে-শাল নয়—সেদিক দিয়েই নয়!' গোবরা এবার অনাবৃত করে: 'শালের কাপড় নিয়ে এসেছে, বেচতে!'

এতোক্ষণ শাল গাছের উত্তুঙ্গ উচ্চতায় বিরাজ করছিলেন, সেখান থেকে অপ্রত্যাশিতভাবে পড়ে গিয়ে হর্ষবর্ধনের বাকশক্তি লোপ পায়!

'শালের কাপড়! বলে কি!' অনেক কষ্টে তিনি নিজেকে খুঁজে পান আবার: 'পাটের কাপড়ই তো হয়, শুনেছি! পাটের নাকি গাছও আছে, শোনা গেছে। কিন্তু—শাল কাঠ থেকে কাপড়! য়্যাঁ। দেখছি, সত্যিই তাহলে বিজ্ঞানের বাহাদুরী আছে বলতে হবে! কালে কালে হলো কি!'

কলকাতার সম্বন্ধে ক্রমশঃই তাঁর আশঙ্কা হতে থাকে। তাঁর ভাবনা হয়, এখানকার ভয়াবহ বৈজ্ঞানিকেরা, ভুলিয়ে-ভালিয়ে, কোন্ দিন হয়তো বাগে পেয়ে গোবরার থেকেই না সুতো বার করে বসে—বানাতে পারলে, তখন তাঁকে ফেলে মাকু ঠেলে গোবরাকে কাপড় বানিয়ে ফেলতে আর কতোক্ষণ? সঙ্গে করে নিয়ে এলেন সাড়ে তিন হাতের এক ভাইকে, একমাত্র ভাইকে; আর বাড়ি ফিরে গেলেন এক জোড়া দশ-হাতি কাপড় নিয়ে। না হয় সাড়ে তিন জোড়া কাপড়ই হলো, তাতেও এমন বিশেষ কিছু সান্ত্বনা তিনি পান না, তেমন কিছু লাভও চোখে পড়ে না তাঁর।

'বলছে ভালো ভালো শাল-দোশালা আছে। ওপরে ডেকে আনবো?' গোবরা তাঁর দুশ্চিন্তায় বাধা দিয়েছে।

'আনবি? আনা উচিত হবে?' ভাইয়ের ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টি রেখে, কৌতূহল তিনি দমন করতেই চেয়েছিলেন, কিন্তু গোবর্ধনের উৎসাহ দেখে তিনি অনুমতি দিয়ে ফেলেন।

'কিন্তু এই সব লোকের সঙ্গে বেশী মিশিস নে যেন। এরা, বৈজ্ঞানিকেরা বড়ো সুবিধের লোক নয়! ভাব করিস নে এদের সঙ্গে। কদাপি না।'

প্রকাণ্ড একটা বস্তাবাহীকে আনুষঙ্গিক করে যে ব্যক্তিটি উপরে এসে উপনীত হয়, বৈজ্ঞানিক কিনা বলা যায় না, তবে ফেরিওয়ালা বলেই তাকে বেশী সন্দেহ হতে থাকে।

তবে সন্দেহ তাঁর বহুক্ষণ স্থায়ী হয় না, ছায়াপাতের সঙ্গে সঙ্গেই, শাল-দোশালার সঙ্গে চাক্ষুষ পরিচয় হবা-মাত্রই, নিঃশেষে তা মিলিয়ে যায়। শাল কাঠের কাপড় দেখে তিনি তো আত্মহারা হয়ে পড়েন, যাদের তাঁরা এতোদিন চেলিয়ে চিরে হদ্দমুদ্দ তক্তাই কেবল বানাতে পেরেছেন, তথাপি তারা প্রায় শক্তই থেকে গেছে, বলতে গেলে ; সেই নিতান্ত অপদার্থদেরই, কী অদ্ভুত বৈজ্ঞানিক-কৌশলে যে এমন চমৎকার, এমন চোস্ত আর এমন মোলায়েম জিনিসে পরিণত করা হয়েছে, তা তাঁর ধারণারও অতীত। আবার রঙের বাহারই বা কতো! হর্ষবর্ধন একেবারে মশগুল হয়ে গেছেন, দু'চোখ ছানাবড়া করে ফেলেছেন। বহুকাল ধরে 'বাঃ' ছাড়া আর কোনো বাক্যই বেরোয়নি তাঁর মুখ থেকে।

গোবর্ধনের উৎসুক জিজ্ঞাসার জবাবে শালওয়ালা তার দামের আন্দাজ জানিয়েছে।

'বটে? পাঁচ টাকা থেকে পাঁচশো টাকা? তা হবে বই কি, দামী একটু হবেই! শাল গাছ তো আর সস্তা নয়, আর ক'টা গাছে একটা কাপড় হয় কে জানে! পাঁচশো টাকা আর বেশী কি এমন?'

'পাঁচ টাকারগুলো বোধহয় শালপাতার তৈরী, কি বলো দাদা?'

'তা নইলে কি অতো সুবিধেয় দিতে পারে? আমরা কিন্তু দামীটাই কিনবো। বের করো তো বাপু—দু'খানা পাঁচশো টাকারই দাও, কি করবে ওরচেয়ে বেশী দামের যখন নেই তোমার কাছে?'

'হাজার টাকা দামের শাল নেই?' গোবরা জিগ্যেস করেছে। শালওয়ালা তৎক্ষণাৎ দুটো দু'হাজারী শাল সৃষ্টি করে ফেলেছে অবলীলাক্রমেই। অবশ্য শ্রীমতী ভানুমতীর অনুমতি নিয়ে।

'হাজার কেন বাবু, দু'হাজার টাকা দামেরও মাল আছে আমার কাছে।' সুবর্ণসুযোগকে সাগ্রহে সে গ্রহণ করেছে: 'উম্‌দা সব চীজ্‌ আমীর লোকের জন্মেই তো বাবু!'

'আছে? বটে? তবে দু'হাজার টাকারই দু'খানা দাও।' মহাসমারোহেই হর্ষবর্ধন শালদের অভ্যর্থনা করেছেন: 'এ তো আমাদেরই জিনিস! আমাদের বুনো আত্মীয়! জংলী বন্ধু আমাদের! কেবল কলকাতায় এসে বৈজ্ঞানিকের ফেরে পড়েই এই দুর্দশা না!'

'দুর্দশা কেন?' শালের জবানী গোবরা আপত্তি জানায়: 'কেন, ভালোই তো করেছে বৈজ্ঞানিকে। চেহারাই ফিরিয়ে দিয়েছে সব এদের।'

'কিন্তু পরমায়ু কমিয়ে দিয়েছে কতো! সেটা তো দেখছিস নে! একটা শাল কাঠের আসবাব পুরুষানুক্রমে টিকে থাকে, জন্মজন্মান্তর ভোগ-দখল করা যায়, কিন্তু কাপড় হয়ে এ আর বাঁচবে ক'দিন? একবার ছিঁড়লেই হলো। শাল গাছের ন্যাকড়া তখন। হায় হায়!'

আত্মীয়ের বিয়োগব্যথায় হর্ষবর্ধন বিমূঢ় হয়ে পড়েছেন। কাতর হবার কথা সত্যিই।

'তা হোক গে!' গোবর্ধন দাদার শোকে সান্ত্বনা দিয়েছে: 'জংলী জিনিসকে একেবারে সভ্য বানিয়ে দিয়েছে, আবার কি করবে?'

দু'হাজার টাকা দক্ষিণা নিয়ে, দু'খানা আলোয়ান গছিয়ে, শাল-ওয়ালা যতো শীঘ্র পেরেছে পিটটান দিয়েছে, ফিরেও তাকাতে ভরসা পায়নি আর। যদি আবার 'পুনর্গছিত' হয়ে যায়! প্রায় দেড় মাইল পেরিয়ে তবে সে ফের শাল-দোশালার হাঁক ছেড়েই ভেবেছে, আর কেন? অন্ততঃ আজ আর কেন? বাণিজ্যের পরিস্থিতি বিবেচনা করে হাঁক ছাড়াই ছেড়ে দিয়েছে, আজকের মতো।

দু'হাজার টাকায় হাল্‌কা হয়ে হর্ষবর্ধনরা কিন্তু দুঃখিত নন। না,

একেবারেই বিমর্ষ নন তাঁরা! বরং অপরিচিত বৈজ্ঞানিক অনাহূত বাড়ি বয়ে এসে অযাচিত শাল দান করে গেছে (হোক না কেন কাঞ্চন মূল্যের বিনিময়ে, তাতেই কি?) তাই ভেবেই তাঁদের অন্তর সকৃতজ্ঞ হয়ে আছে তখন থেকে। তাঁদের অমূল্য কাঠ যে কোনোদিন নিজেদের গায়ে উঠবে, (অন্তিমে দেহরক্ষার পূর্বে) এবং গায়ে উঠবে এতো হাল্‌কা হয়ে, মোলায়েম হয়ে, আর এ হেন বেমালুম হয়ে, এ কথা কোনোদিন তাঁরা কল্পনা করতে পারেননি। শাল গাছ ভেঙে গায়ে পড়তে পারে ভাবতেই গায়ে কাঁটা দিয়েছে আগে, ঘুমের ঘোরেও তার মড়মড়ানি শুনে শিউরে উঠেছেন, বুকের ধড়ফড়ানি থামতে চায় নি, সেই শাল যে একদা এতোখানি গায়ে-পড়া হবে, কেবল গায়ে-পড়া নয়, হামেসা গলাগলি হয়ে মেলামেশা করবে, ভাবতেই পারেননি কখনও। সেই বস্তু, সম্বন্ধীর চেয়েও মধুরতর সম্বন্ধে, নিকটতর সম্পর্কে, অনিষ্টহীন ঘনিষ্ঠতায়, সম্প্রতি তাঁদের সর্বাঙ্গে বিজড়িত। ভাবতেও রোমাঞ্চ হয়! অপরূপ রূপকথাই যেন! শালের গর্বে তাঁদের হৃদয় ক্রমশঃই বিশালতর হয়েছে।

আনন্দের অতিশয্যে গোবরা তখনই প্রস্তাব করে বসেছে: 'চলো দাদা, গায়ে জড়িয়ে একটু বেড়িয়ে আসা যাক।'

পরমুহূর্তেই তাঁরা আস্তানা ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছেন রাস্তায়, শাল গায়ে চাপিয়ে বেড়াতে!

কিন্তু অঙ্গে শালের ঠাঁই দিয়েও, যদি উঁচু নজর না-ই থাকে, দুঃখের কারণ প্রায়ই ঘটে। যেতে যেতে অকস্মাৎ হর্ষবর্ধনের মনে হয়েছে কী যেন পড়লো অন্তরীক্ষ থেকে—নিতান্ত ঘাড়ের কাছটাতেই। তিনি ঘাড় কাৎ করে দেখেছেন, তার পরে আকাশে দৃক্‌পাত করে দেখেছেন—না, সন্দেহ নিতান্ত অমূলক নয়।

বিরক্তিব্যঞ্জক একমাত্র ধ্বনি বেরিয়েছে তাঁর মুখ দিয়ে: 'ভ্যা!'

গোবর্ধনও দাদার দৃষ্টির অনুসরণ করেছে, তারপরে, প্রতিধ্বনি

না করেই, শালকে গা থেকে খুলে পুঁটুলি-প্রমাণ বানিয়ে নিজের বগলের মধ্যে পাঠিয়ে দিয়েছে বিনা বাক্যব্যয়ে।

কাকদের সঙ্গে ষড়যন্ত্র ছিলো কিনা বলা যায় না, একটু যেতেই কাছাকাছি একটা শাল-কাচানোর দোকান সামনে পড়েছে। গোবরা দাদার শালটা কাচতে দেবার ইঙ্গিত করেছে, হর্ষবর্ধন কিন্তু তাতে আপত্তি জানিয়েছেন: 'কী হবে আর কাচতে দিয়ে? বাড়ি গিয়ে খুলে ফেললেই হয়; রাস্তায় ফেলে দেয়াও চলে, কাউকে বিলিয়ে দেয়াই বা মন্দ কি? তারপর একটা ভালো দেখে, নতুন দেখে কিনে নিলেই হলো! কালকেই আবার এসে পড়তে পারে সেই বৈজ্ঞানিকটা। আরো বেশী দামী দামী শাল নিয়ে কাল সকালেই হয়তো এসে পড়বে!'

গোবরা দাদার চেয়ে বিবেচক! সে বলেছে: 'বাঃ, গায়ে না দাও, চৌকিতে পাতা চলবে তো? বিছানার চাদর করতে দোষ কি? ক্ষতিই বা কী?'

শালের-চাদর-প্রস্তাবটা নেহাৎ অমনঃপূত হয়নি হর্ষবর্ধনের। তক্ষুনি কাচানো-ওলাকে শালটা সম্প্রদান করে ফেলেছেন; 'কতো লাগবে বাপু, আর কবে ফেরৎ পাওয়া যাবে, বলো তো ঠিক করে?'

'কালই সকালে দিয়ে আসবো, আপনার বাড়িতে। ভালো আলোয়ান কিনা, কাচতে যত্নই লাগবে, কতো আর দেবেন? টাকা দুই দিলেই চলবে।'

'মোটে দু'টাকা? এতো দামী জিনিস কাচতে দু'টাকা মাত্র? বলো কি হে?' মণিব্যাগ থেকে একখানা দীর্ঘকায় নোট বার করেছেন হর্ষবর্ধন: 'বেশ, তাই। আটানব্বইটা টাকা আছে তো?'

'অতো টাকা, গরীব মানুষ আমরা, কোথায় পাবো—বাবু?'

'বাঃ, একশো টাকার নোট যে!' গোবরা প্রাঞ্জল করেছে: 'তা ছাড়া খুচরো নোট তো নেই আমাদের সঙ্গে।'

'তবে তোরটাও ওকে ধোলাই করতে দিয়ে দে না, গোবরা?'

'কিন্তু তাতেই আর কতো বাড়বে, বলো? চার টাকাই তো?' শালটাকে বগলচ্যুত করতে করতে গোবরা বলেছে।

'এই নাও, এই শাল দুটো, আর, এই নাও নোটখানা।' হর্ষবর্ধন উপদেশ দিয়েছেন: 'পঁচিশবার করে কাচবে প্রত্যেকখানা, তা হলেই একশো টাকা ফুরিয়ে যাবে! এক পয়সাও ফেরৎ দিতে হবে না তোমাকে। চুকে যাবে হাঙ্গামা। না—কি বলিস গোবরা? পঞ্চাশবার করেই কাচবে নাকি? আরও একখানা নোট তা হলে দিয়ে দেবো ওকে? পঁচিশবারে কি যথেষ্ট পরিষ্কার হবে না বলে তোর মনে হয়? না, পাঁচশোবারই কাচিয়ে ফেলবো একেবারে? কী বলিস তুই, য়্যাঁ?'

এক সঙ্গে এক গাদা নোটে তিনি হস্তক্ষেপ করেছেন।

প্রতিবাদ এসেছে শাল-কাচিয়ের দিক থেকেই। নিজেই সে আপত্তি করেছে, পঁচিশবারের কাচাকাচিই সারাদিনে কুলিয়ে ওঠানো অসম্ভব, তার ওপরে আরো পঁচিশ কিংবা পাঁচশো ধাক্কা বাড়লে, নেহাৎ অক্কার দিকেই পা বাড়াতে, বেমক্কাই মারা পড়তে হবে ওকে। অবশ্যি তাতে করে আরো বেশী পরিষ্কার হবে নিঃসন্দেহ, কিন্তু এতো বেশী নির্ঘাৎ যে, যাকে বলা যেতে পারে, একদম পরিষ্কার! ঢাকাই মসলিনের চেয়েও আরও সূক্ষ্মতর হয়তো, চর্মচক্ষে দেখতে পাওয়া যাবে কিনা কে জানে! শালও জখম, সে নিজেও খতম! আরো একশো টাকা, কি এক হাজার, এমন কি দশ হাজার টাকার নগদ মজুরিতেও সে কর্ণপাত করেনি, কানে আঙুল দিয়ে পিছিয়ে গেছে সভয়ে, হর্ষবর্ধনের পরামর্শকে অবহেলা করেছে, অকাতরেই; পীড়াপীড়িতেও, কিছুতেই, অর্থ-গ্রহণে মুক্তহস্ত হতে রাজি করানো যায়নি তাকে। অগত্যা, ক্ষুণ্ণ মনে, অবশেষে পঁচিশবারের কড়ারেই রফা করেছেন দু'ভাই। কী আর করবেন? ওঁদের অবশ্য আরো বেশী এবং

আরো পরিষ্কার দেখার কৌতূহল ছিলো, কিন্তু মজুরিতে না পোষালে কারুকে বেশী কড়াকড়ি করা চলে কি? তোমরাই বলো?

পরদিন প্রাতঃকালে ওঁদের ঘুম ভালো করে ভাঙতে-না-ভাঙতেই আবার তেমনি কড়া নাড়ার কড়া আওয়াজ শোনা গেছে সদরে। হর্ষবর্ধন পাশ ফেরার প্রলোভন সম্বরণ করেছেন: 'সেই বৈজ্ঞানিক এসেছে বোধ হয়। সমাদর করে নিয়ায় গে!'

কিন্তু যাই বলো দাদা, কড়া-ধ্বনি কখনও চাটু হয় না।' যেতে যেতে অসন্তোষ-জ্ঞাপন করেছে গোবরা। 'কড়াতে আর চাটুতে অনেক তফাৎ।'

'কিন্তু না, সে বৈজ্ঞানিক না ভুলবশতঃ, বা দৈবক্রমে, নিতান্তই এসে পড়েনি সে। নিষ্কাম এবং অকর্মার ধাড়ী—সেই শাল-কাচিয়েই এসে হাজির।

'এই নিন বাবু, আপনাদের শাল!' এই বলে ছোটো-খাটো, কিন্তু বেশ হৃষ্টপুষ্ট দু'খানি রুমাল সে বার করে দেয়। "আর এই নিন, ষোলো টাকা ফেরত।'

'এই সেই শাল নাকি?' দু'ভাই পরস্পরের দিকে তাকান, বিমূঢ় হয়ে। 'এ্যাতো খাটো হয়ে গেলো কি করে?' ভারী হক্‌চকিয়ে যান হর্ষবর্ধন আর গোবর্ধন।

'আর টাকাই বা কিসের?' বিস্ময়ের উপর আরো বিস্ময়! 'কিসের ফেরত টাকা?'

'একুশবারের বেশী কিছুতেই ধোলাই করা গেলো না, তাই বাকী মজুরি ফেরত দিলাম, মশাই!' শাল-কাচিয়ে বলে, 'দারুণ বিরক্তির সঙ্গেই বলে, কি শাল বাবু, আপনাদের—যতোই কাচি ততোই গুটিয়ে আসে, ক্রমেই কেমন জমে গিয়ে জড়ো হয়ে ছোটো হয়ে যায়!'

'বটে? ভারী তাজ্জব!' শালের বেয়াড়া হাব-ভাবে তাক লাগে, দুই ভায়েরই।

'একুশবার কাচতেই তো এই দশা, তাতেই এই রুমালে দাঁড়িয়েছে। আর বেশী কাচতে সাহস হলো না মশাই, কি জানি, যদি ক্ষইতে ক্ষইতে খোয়া যায়, ছোটো হতে হতে হারিয়ে যায়, অদৃশ্য হয়ে যায় সব শেষে! তখন আপনারা তো আমাকেই দুষবেন, আলোয়ানের দোষ তো আর দেখবেন, না বাড়ির ছেলের দোষ কবে আর কে দেখে, বলুন?

'শালের এমন বদ অভ্যাস আর কখনও দেখেছো কি?' বেশ কৌতূহল হয় গোবরার।

'কখনো না। অবশ্যি কখনো-কখনো ধোয়ালে এক-আধটু খাটো হয় বটে, হয়েই যায় এমনিতেই, কিন্তু এতোদূর—? উঁহু, এজন্মে দেখিনি বাবু! আর কি করেই বা দেখবো বলুন? কখনও তো একবারে একুশবার কাচবার সুযোগ পাইনি, (যদিও ওর মতে সেটা দুর্যোগ) একুশবারেই একুশবার কেচেছি, হয়তো একুশ বছর ধরে—নজরে পড়েনি তাই আর।'

শাল কাচিয়ে চলে যায়, সেলাম না করেই। একদিনেই বেজায় কাহিল হয়ে পড়েছে বেচারা; কাচানো শালের মতোই, কে যেন ধুয়ে মুছে নিয়ে গেছে ওকে।

হর্ষবর্ধনের ভাবনা শুরু হয়েছে। খবরের কাগজে যে সব নামজাদা সাবান প্রায় দেখা যায়—পামোলিভ, ভিনোলিয়া, মহীশূর চন্দন কিংবা কিউটিকিউরা, এমন কি একটু দামী কার্বলিক সোপেও, নিশ্চয় কাচানো হয়নি এদের; খোলা জিনিসে সস্তায় সারতে গিয়ে শালটাকে সেরে ফেলেছে একেবারে। বনেদী মাল এ সব! আসামের শালবনের! যে-সে জঙ্গলের না তো! কতোকালের অরণ্যানী এরা! মানী জিনিসের মর্যাদা রাখা হয়নি, ভাটা সাবান মাখানো হয়েছে, চার ধার থেকেই মাথা কাটা গেছে বেচারার, তাতেই লজ্জায় একদম সঙ্কুচিত হয়ে পড়েছে—আর কিছু না!

নিজের ধারণা হর্ষবর্ধন বেশীক্ষণ ধারণ করেননি, ধড়েতে। তা চাপা গলায় গোবরার কাছে বেফাঁস করেছেন : 'তাই আমার মনে হয়। তাতেই এ হাল হয়েছে শালের।'

'এ তো ধোলাই করা নয়, এ যে একেবারে আস্ত ধোলাই করা' গোবরা খাপ্পা হয়ে গেছে ; 'মার-পিটই বলা যেতে পারে বরং। আগে বললে না কেন, দাদা ? আমিও দিতাম ঐ ব্যাটাকে ধোলাই করে এক্ষুণি'

'শাল-দোশালার কাণ্ড। কে জানবে বল্!' গদ্‌গদ্ করে হর্ষবর্ধন বলেন।

'শালের কথাই বলো ! দোশালা তুমি পাচ্ছো কোথায় আবার' অন্য বস্তুর বিজ্ঞাপন শুনতে রাজি নয় গোবরা।

'কেন, পাচ্ছি না কেন ? সামনেই পাচ্ছি। একজন হচ্ছে সে বৈজ্ঞানিক, যে শাল জিম্মা দিয়ে গেছে, আর একজন ইনি, যিনি তা কিম্মা বানালে ! এই দু'জনেই—তো !' হর্ষবর্ধনের সঙ্গে সঙ্গে ব্যাখ্যা 'যাক গে, ভালোই হয়েছে ! দু'হাজার টাকার দু'খানা রুমাল—মন্দ কি আর এমন ?'

হর্ষবর্ধন ভেবে চিন্তে খুশিই হন ; লাটদেরও এতো দামী রুমাল নেই সম্রাটদেরও না। সস্তা সাবানে কেচে শালটাকে একেবারে লাট করে ফেলেছে লোকটা ! যাক, ভালোই করেছে। মন্দ কি ? বাঃ বেশ হয়েছে, তোফা ! বাঃ বাঃ !'

লাট-দু'জনকে, যতোই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে নেড়ে-চেড়ে দেখেন, তাঁর হর্ষধ্বনি ততোই উথলে উঠতে থাকে। থামে না আর !